মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি

পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী

প্রধান কার্যালয় ঃ ১০/ই-এ/১ মধুবাগ, নয়াটোলা, মগবাজার,ঢাকা-১২১৭

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)

দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০ ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২,

মোবাইল ঃ ০১৭ ৯০৭৭৮৫

পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল

প্রথম ঃ অক্টোবর ১৯৮৪, আশ্বিন ১৩৯১, রমযান ১৪০৪॥

দ্বিতীয় ঃ নভেম্বর ২০০২, কার্তিক ১৪০৯, রমযান ১৪২৩ ॥

প্রকাশক

মোস্তাফা জহিরুল হক

খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ

আবদুল্লাহ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস

মোস্তাফা কম্পিউটার্স

১০/ই-এ/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ

আফতাব আর্ট প্রেস, ২/৩ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

আমাদের কথা

আধুনিক যুগে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার পথে একটা বড় রকমের বাধা আমাদের শিক্ষিত সমাজের এক বিরাট অংশের মধ্যে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব। শত শত বৎসরের ঔপনিবেশিক শাসন এবং শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে আমাদের অনেকের মধ্যে অন্ধ পাশ্চাত্য-প্রীতি এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, আমাদের নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের প্রতি আমাদের বিশ্বাস যথেষ্ট শিথিল হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, আমরা অনেকে যেন জীবন ও জগৎকে পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে দেখতে ও বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তির দুর্বলতা আধুনিক বিশ্বের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে অগ্রসর চিন্তাধারকদের অনেকের কাছেই প্রকটভাবে ধরা পড়ে গেছে। এমন কি উনিশ শতকে পাশ্চাত্য জগতে যা অভ্রান্ত সত্য বলে বিবেচিত হতো, তারও অনেক কিছু খোদ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদের অনেকের নিকটই আজ আর নির্ভুল বিবেচিত হচ্ছে

না। এমতাবস্থায় ইসলামী রেনেসাঁর সাফল্য ত্বরান্বিত করার স্বার্থে আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে চুলচেরা সমালোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বাংলা ভাষায় এ ধরনের ভাল বইয়ের নিতান্ত অভাবের দিক বিবেচনা করে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি' নামক গ্রন্থ রচনা করে জাতির প্রতি এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিভ্রান্তি আমাদের শিক্ষিত সমাজের কাছে প্রকৃত প্রেক্ষাপটে তুলে ধরতে পুস্তকখানি যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকটি প্রথমে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশ করে, বর্তমানে খায়রুন প্রকাশনী-এর দ্বিতীয় প্রকাশ বাংলাদেশের জনগণের সামনে উপস্থাপিত করতে পেরে আনন্দিত। আল্লাহ পাক আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন।

প্রকাশক

ভূমিকা

বিভিন্ন সময়ে লিখিত ও প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত পাঁচটি দীর্ঘ প্রবন্ধ সমন্বয়ে এই গ্রন্থটি গ্রন্থায়িত। মূল প্রতিপাদ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার দর্শনিক ভিত্তি। আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিশ্ব পরাশক্তিসমূহের ঝোঁক, প্রবণতা, নীতি-পদ্ধতি ও মানবতার প্রতি আচরণের মূলে নিহিত প্রকৃত অবস্থাকে জানবার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটি আলোচনায়।

ঢাকাস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমাকে সুধী পাঠকবৃন্দের সমীপে হাজির হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, সেই জন্য মহান আল্লাহ তা'আলাকে লাখো শোকর।

আমার আলোচনাসমূহ কতটা যথার্থ তার বিচার পাঠকবৃন্দেরই করণীয়। আমি যে-কোন সমালোচনা শুনবার জন্য প্রস্তুত।

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

াখালপাড়া
২১
।৯৮৩ ইং

সূচী পত্র

ইউরোপে চিন্তবিপ্লব ৯
সেকিউলারিজম ২১
ডারউইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব ৪১
ফ্রয়েডের মনস্তত্ব ৬৫
মার্কসীয় দর্শন ৯৯

পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি

ইউরোপে চিন্তা বিপ্লব

মুসলমানরা যেকালে বাগদাদ, মিশর ও স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিগন্তপ্লাবী আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, সে সময় সমগ্র ইউরোপ অজ্ঞতার সূচিভেদ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ইউরোপীয় ইতিহাসে এই যুগটি অন্ধকার যুগ (Dark age) নামে অভিহিত। এ সময়ের স্পেনের মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অংকশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান শিক্ষা দানের ব্যাপক ব্যবস্থা বর্তমান ছিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীরা এসে এখানে ভিড় জমিয়েছিল। তারা গ্রানাডা ও কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগদান করে নিজেদের ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করত। প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্স ও ইটালী থেকেও বহুসংখ্যক জ্ঞানপিপাসু এ শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে এসে জমায়েত হতো এবং মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত এ বিশাল জ্ঞানকেন্দ্র সমূহে মুসলিম মনীষীদের নিকট শিক্ষালাভ করে ও উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ করে নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তন করে লব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচারে আত্মনিয়োগ করত। এরই ফলে ইউরোপ ধীরে ধীরে অজ্ঞতা ও মূর্খতার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে জাগ্রত হতে শুরু করে এবং তার পরিণতি স্বরূপ সমগ্র ইউরোপে নবজাগরণের জোয়ার প্রবাহিত হয়, আসে রেনেসাঁর যুগ। খ্রিস্টীয় ষোল ও সতের শতকে এই জাগরণ অধিক ব্যাপকতা ও সমৃদ্ধি লাভ করে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও রোমে এ সময়েই বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে সব স্থানে জ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যাপক ব্যবস্থা কার্যকর হয়। অপরদিকে এ সময়েই ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সাধিত হয়। নিত্য নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হতে শুরু করে এবং সূচিত হয় এক নতুন শিল্প যুগ। এ শিল্পযুগে ইউরোপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূ-খন্ডে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করার ও বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ গড়ে

তোলার মহান সুযোগ লাভ করে। এভাবে শিল্প-উৎপাদন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধন-ঐশ্বর্যের বিপুল প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চায়ও ইউরোপ সমধিক অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত ইউরোপীয়দের জীবনদর্শনে চিন্তা ও মতবাদে বিশেষ কোন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা খ্রিস্টীয় রোমান ক্যাথলিক ধর্ম বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, মানুষের প্রাণ-সত্তার অস্তিত্ব ও পরিস্থিতি, পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তি, নৈতিক মূল্যমান ও খ্রিস্টীয় প্রেম-ভালোবাসার চর্চা প্রভৃতি ধর্মীয় ভাবধারা উনবিংশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে।

কিন্তু এই উনবিংশ শতকেই ইউরোপবাসীদের চিন্তাধারায় মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। শিল্প-বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও অগ্রগতির ফলে ইউরোপ সকল ক্ষেত্রে নতুনত্ব সৃষ্টির লীলাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য তাদের সাহস, কর্মোদ্যম ও কর্মচাঞ্চল্য বিপুলভাবে বৃদ্ধি করে দেয়, যন্ত্রপাতির নিত্যনব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনীর ফলে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রায় সব কটি বিভাগে যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ প্রবল ও প্রকট হয়ে ওঠে। সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশ্বলোককে একটা বিরাট 'যন্ত্র' মনে করতে শুরু করা হয়। পূর্ববর্তী ধর্মতাত্ত্বিক মতাদর্শ (Metaphysical Ideas) সন্দেহপূর্ণ ও অবিশ্বাস্য বলে ধরে নেয়া হয় এবং এ পর্যায়ের সব চিন্তা ও মতাদর্শকে যান্ত্রিক নীতিতে (Mechanical Principles) পুনর্বিবেচনা করার চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। গোটা সমাজ ও সংস্কৃতিতে বৈষয়িকতাবাদী-বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল হয়ে ওঠে। আদর্শ ও নৈতিকতার গুরুত্ব লঘু হয়ে যায় এবং সুবিধাবাদ ও স্বার্থবাদের ভিত্তিতে নতুন নীতিদর্শন (Ethics) বিরচিত হয়। এমনকি মানুষকে একটা 'জীবন্ত চলমান যন্ত্র বিশেষ' প্রমাণ করার প্রবণতা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় এবং বর্তমান ও সাম্প্রতিক সংক্ষিপ্ত জীবনটুকু ছাড়া তার কোন অতীত বা ভবিষ্যত আছে বলে বিশ্বাস করতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয়। এই সময় সার্বিকভাবে ইউরোপীয় জনগণের মধ্যে যে চিন্তা-বিশ্বাস ও মনোভাব-মানসিকতা দানা বেঁধে উঠতে থাকে, তারই পারিভাষিক নাম হচ্ছে 'সেকিউলারিজম'।

ইউরোপীয় সমাজের তদানীন্তন পরিবেশ পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে জনগণের এ যান্ত্রিক মনোভাবের জন্যে বিশেষ কোন ব্যক্তিকে দায়ী করা চলে না, কারুর কোন বিশেষ ইচ্ছাগত সিদ্ধান্ত বা চেষ্টা সাধনার ফলে এরূপ হয়েছিল বলেও দাবি করার কোন অবকাশ নেই। ইউরোপীয় সমাজে তখনকার সমগ্র পরিবেশই পুরোপুরিভাবে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির অনুকূল ছিল। সমগ্র সমাজের গতি এদিকেই নিবদ্ধ ছিল, একটা তীব্র ও বিদ্বেষমূলক বৈষয়িকতাবাদী (Secularist) বস্তুবাদী ভাবাবেগই যেন গোটা ইউরোপীয় সমাজকে সর্বাত্মকভাবে গ্রাস করে বসেছিল। এইরূপ অবস্থায় মানুষ নিতান্ত বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণে চিন্তা ও গবেষণা পরিচালনা করতে যেন একান্তভাবে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। তখনকার সমাজে যান্ত্রিকতা ও বৈষয়িকতার নীতিতে যে তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা পেশ করা হতো তা মন ও মানসকে পরিতৃপ্ত করতে না পারলেও সঙ্গে সঙ্গেই তা সর্বজন গৃহীত হয়ে যেত। প্রকৃতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার (Physical Science) যান্ত্রিক নীতিসমূহ তখন জ্ঞান গবেষণায় এমন উজ্জ্বল প্রদীপ বলে মেনে নেয়া হয়েছিল যে, তার চোখ ঝলসানো চাকচিক্য ও আলোকচ্ছটায় প্রত্যেক চিন্তাবিদ ও গবেষক গভীরভাবে প্রভাবিত হতে বাধ্য হয়েছিল।

বিশ্বলোক (Universe) ও মানুষকে বৈষয়িক ও যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণে বিচার করার একটা তীব্র প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এসব কারণে খ্রিস্টান ধর্মীয় পণ্ডিতেরা তাঁদের খ্রিস্ট ধর্মকে এক মহাবিপদের সম্মুখীন দেখতে পেয়ে রীতিমতো কেঁপে উঠেছিলেন এবং খ্রিস্ট ধর্মকে জ্ঞান ও চিন্তার নতুন আলোর আঘাত থেকে রক্ষা করার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। অধ্যাপক উইলিয়ামস বেক এ সময়কার অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

> হাকস্‌লি (Huxley) যখন মানুষের আদি পুরুষ সম্পর্কে নিজের মতবাদ প্রচার করলেন, তখন মানুষের পরিকল্পিত অপমানের জন্যে লোকেরা শত বছর পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকল। আর পবিত্রতা ও নৈতিকতার প্রবক্তারা বলতে শুরু করল যে, বিজ্ঞান তার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক চিন্তার ফলাফল ঘোষণা করলেও অনুরূপ চিৎকার উঠেছিল। তা সত্ত্বেও কালের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মতাদর্শ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ

করে। বস্তুত এ দু'টি মতাদর্শ সমগ্র মানব সমাজের সংস্কৃতি, ধর্ম, কৃষ্টি ও চিরন্তন কালের চিন্তা-বিশ্বাসের ওপর অপরীসীম প্রভাব বিস্তার করল।

এ সময় ইউরোপে বর্ষাকালীন পোকামাকড়ের মতো অসংখ্য মতবাদ গড়ে ওঠে। তন্মধ্যে সেকিউলারিজম ভিত্তিগত মতাদর্শ বা অসংখ্য মতবাদের উৎস হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। এই মতবাদটিকে ভিত্তি করেই চিন্তাবিদগণ তাদের চিন্তা ও মতবাদ রচনার কাজ চালিয়ে গেছেন। এই পর্যায়ের চিন্তাবিদদের মধ্যে তিনজন বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং এ তিনজনই চিন্তার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। এ তিনজনের একজন হলো চার্লস ডারউইন। তিনি বিবর্তনবাদী মতবাদের উদ্গাতা। দ্বিতীয়জন সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড। আধুনিক মনস্তত্ত্ব তারই অবদান। আর তৃতীয়জন কার্লমার্কস। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ তার কল্পনার ফসল। এক কথায় এ তিনজন চিন্তাবিদ পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টা বা নির্মাতা বলে অভিহিত। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তিভূমি এই তিনজনের চিন্তাধারাই সম্মিলিতভাবে রচনা করেছে। এদের উপস্থাপিত মতাদর্শ পাশ্চাত্যের লোকদের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, প্রভাবিত করেছে এবং তাতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। এ কালের চিন্তাবিদদের মতে এদের চিন্তাধারাকে বাদ দিয়ে একালের পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন সম্পর্কে কোন আলোচনাই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

প্রসঙ্গত বলা যায়, এই চিন্তাবিদ ত্রয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয়জন সর্বজন জ্ঞাতভাবেই ইসলাম ও মুসলমানদের চির দুশমন ইয়াহূদী বংশজাত।[১] আর প্রথমজন নিজে ইয়াহূদী না হলেও তার সমস্ত চিন্তা ও মত ইয়াহূদীদের দ্বারাই ব্যাপক প্রচারিত ও তাদের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে সর্বাত্মকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

১. ইয়াহূদী জাতি জাতীয় ভাবেই খোদাদ্রোহী। সকল প্রকারের অনিষ্ট সাধনে সিদ্ধ হস্ত। হিংসা-বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা এবং মহাজনী পুঁজিদারী এই জাতীয় রক্তে মাংসে মিশ্রিত। দুনিয়ার যেখানেই কোন গণ্ডগোল হয়েছে বুঝতে হবে তার পিছনে অবশ্যই ইয়াহূদীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হাত রয়েছে। অতীতের কথা বাদ দিলেও বর্তমান দুনিয়ায় এই জাতির উদ্ভাবিত অকল্যাণ সৃষ্টিকারী প্রধান মতবাদ সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম এদেরই অবদান। সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ

চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) দীর্ঘ কয়েক বছরকাল ধরে গাছপালা, বৃক্ষলতা ও জীব-জন্তুর গভীর জীবতাত্ত্বিক অধ্যয়ন করেন এবং দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন ও গবেষণার পর Origin of Species নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থেই তিনি তার চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী মতবাদটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেন। সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্বকে তিনি শুরু থেকেই অস্বীকার করে এসেছেন। তার দৃষ্টিতে তা একটা ধাঁধাঁ বা 'নিছক কল্পনা' ছাড়া আর কোন মর্যাদারই অধিকারী হয়নি। কিন্তু মানুষের দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক কার্যক্রমের কোন ব্যাখ্যা দান তখনকার বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উত্তরকালে ডারউইনী বিবর্তনবাদ যখন দৈহিক কার্যক্রমের একটা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা পেশ করেছিল, তখন ইয়াহূদী চিকিৎসাবিদ ফ্রয়েড কর্তৃক

পুঁজিবাদেরই একটি আকর্ষণীয় রূপ মাত্র। ইয়াহূদীরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ও পরিকল্পনা সহকারে এই মতাদর্শের বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চালিয়েছে। এই মতবাদের রচয়িতারাও বড় বড় নেতা; সকলেই দৃঢ় প্রত্যয় সম্পন্ন ইয়াহূদী। ১৯১৭ সনের রুশ বিপ্লব মূলত ইয়াহূদীদেরই চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফসল। এ বিপ্লবের হীরো লেনিন ইয়াহূদী মত প্রচারে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত ছিলেন। ইয়াহূদী লোকেরাই এ বিপ্লবকে সমর্থন ও তার কল্যাণের ব্যাখ্যা করে সব চাইতে বেশি গ্রন্থ রচনা করেছে। ইয়াহূদী মহাজনী কাজে ও জাতীয় উন্নয়নে সব চাইতে বড় অবদান রয়েছে রাশিয়ার। আজকের দুনিয়ায়ও ইয়াহূদীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে রাশিয়া।

আমেরিকা ও রাশিয়া বাহ্যত দুটি প্রতিপক্ষ হলেও ইয়াহূদী স্বার্থের প্রশ্নে উভয়ের নীতি অভিন্ন। তাই বলা যায়, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সাথে ইয়াহূদীবাদ ওতোপ্রোত জড়িত। আর বর্তমান দুনিয়ার পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ধরনের রাষ্ট্র ও সমাজ আলোচ্য তিনজন চিন্তাবিদদের দার্শনিক চিন্তাধারার বড় সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক, ধারক ও অনুসারী। আজকের দুনিয়ার এই দুই পরাশক্তির চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণ সম্যকভাবে জানতে ও বুঝতে হলে এই তিনজন চিন্তাবিদের দার্শনিক চিন্তাধারাকে গভীরভাবে বুঝতে হবে।

এঁদের প্রত্যেকেরই চিন্তা-গবেষণার মূলে নিহিত রয়েছে 'সেকিউলারিজম' মতবাদটি। প্রথমে তারা ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করে, ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব থেকে নিজেদের মন-মগজকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেই নিজ নিজ বিষয়ে স্বাধীনভাবে গবেষণা চালিয়েছেন। এই কারণে 'সেকিউলারিজম' মতাদর্শটিকে সর্বপ্রথম গভীরভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। তার পরই উক্ত প্রধান তিনজন চিন্তাবিদের চিন্তাধারা উপলব্ধি করা সম্ভব হতে পারে।

উপস্থাপিত হলো মনস্তাত্ত্বিক (কার্যক্রমের জড়বাদী বা যৌনবাদী) ব্যাখ্যা। ফ্রয়েড উনিশ শতকের শেষ দশকে ভিয়েনায় মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি এক অভিনব পন্থার সাহায্য গ্রহণ করেন। এ পন্থার নাম হলো 'মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' (Psycho Analysis)। এই প্রসঙ্গে তিনি যেসব মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিক মতবাদ ও চিন্তাধারা উপস্থাপিত করেন, অধ্যাপক উইলিয়াম্‌স্ বেক সেগুলোকে বিজ্ঞান-চিন্তার ফসল আখ্যায়িত করেছেন এবং তার প্রতিবাদ, সমালোচনা বা বিপরীত চিন্তাকে 'চিৎকার' বলে অভিহিত করেছেন। এই মতাদর্শ ও চিন্তাধারা ডারউইনের ক্রমবিকাশ দর্শনের সাথে মিলিত হয়ে সেকিউলার বা ধর্মহীন বরং ধর্মবিরোধী জড়বাদী এবং নাস্তিক্যবাদী প্রবণতাকে খুবই বলিষ্ঠ করে তুলেছে। ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাসকে তো কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন বলে তার প্রতি উৎকট ঘৃণা প্রকাশ করেছেই। মানুষের যে কোন উচ্চ মর্যাদা ও মহান জীবন-লক্ষ্য থাকতে পারে, প্রেরিত হয়ে থাকতে পারে কোন মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে— কিংবা তা হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এরূপ মনোভাবকে অপরিপক্ক চিন্তা ও নিতান্তই খোশ-খেয়াল বলে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর এই চিন্তা ও মন-মানসিকতা আল্লাহ অস্বীকৃতির দিকে আরও অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

ডারউইনের মতবাদ মানুষের মানবিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যমানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। আর ফ্রয়েড মানুষের উন্নতমানের মহান পবিত্র চরিত্র গুণের উপর তীর চালিয়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। অতঃপর কার্লমার্কস এসে সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তনের মূলে অর্থনৈতিক কার্যকারণের অনিবার্যিক কার্যকরতা প্রমাণ করে মানুষকে নিতান্তই অর্থনৈতিক জীব প্রমাণ করতে বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন।

মার্কস ১৮৬৭ সালে (Das Kapital) নামে একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। তাতে অর্থনীতি পর্যায়ে বহু বিপ্লবী চিন্তাধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়েছেন। এই গ্রন্থটিই হলো 'কমিউনিজম' ধর্মের 'বাইবেল'।

এ গ্রন্থের মূল বক্তব্য হলো, বিশ্বলোকেরা নৈসর্গিক সম্পদ ও উপায়-উপাদান এবং শ্রমিকের শ্রম দিয়েই সমস্ত ব্যবহার্য দ্রব্য ও পণ্য উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ উপায়-উপকরণের উপর সকলেরই সমান অধিকার।

অতএব উৎপন্ন ব্যবহার্য পণ্য সবই শ্রমিকদের শ্রমেরই ফসল। মালিকের ব্যবস্থাপনা (Management) শ্রমিকদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাদের ব্যক্তিগত শ্রম অপেক্ষা অনেক বেশি লাভ করার লোভে সমস্ত বিবর্তনবাদী মতাদর্শ (Theory of Evolution) পেশ করেন।

এই ক্রমবিকাশ তত্ত্বের দৃষ্টিতে মূল জীবনটাই যেন ক্রমবিকাশমূলক কার্যক্রম। তা একটি অতি নগণ্য সূক্ষ্ম কীট থেকে শুরু হয়ে বিবর্তনের ধারা অবলম্বন করে এই মানুষ পর্যন্ত উপনীত হয়েছে। এ ক্রমবিকাশ কার্যক্রমের কার্যকরণ (Cause) একান্তভাবে জৈবিক, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক। মৌল উপাদানের কোন প্রাথমিক আকস্মিক সংঘাত কেবল একটিমাত্র সূক্ষ্ম জীবকোষ (Life Cell) সৃষ্টি করেছে। পরে তাতে বিপুল জীবন সংগতি ও বেঁচে থাকার যোগ্যতার উদ্ভব হয়। কালের ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে শক্তি পরীক্ষা এবং কোটি কোটি বছরের ক্রমাগত প্রাকৃতি নির্বাচন (Natural Selection) ও ক্রম অভিব্যক্তি প্রবণতা (Evolutionary Trend) এ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবকোষ (Germplasm)-কে বিকাশ দান ও রূপান্তর সাধন করে এখনকার মানুষের আকৃতি বাস্তবায়িত করেছে। ক্রম-বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে জীবসমূহের বিভিন্ন আকার-আকৃতির উদ্ভব হয়েছে। দূর অতীতের সে সব জীব-জন্তুর অবশিষ্ট এখনও কিছু বেঁচে আছে। আর অনেক-ই নিশ্চিহ্ন হয়ে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।[১]

বিশ্বলোকে জীবনের উন্মেষ এবং বিভিন্ন প্রজাতীয় অভিব্যক্তির ডারউইনীয় ব্যাখ্যা মানব জীবন সংক্রান্ত যুগ যুগ থেকে চলে আশা ধারণা, বিশ্বাস (Conception) ও মূল্যমানকে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির খোলাহাটে নির্মমভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও অপদস্ত করেছে। শাশ্বত মূল্যমানের এ অপমানে নীতিবাদীরা চিৎকার করে উঠেছে বটে; কিন্তু আধুনিকতাবাদীদের মন ও মানস সেই ব্যাখ্যাকেই পরম সত্য রূপে গ্রহণ করেছে এবং তাতেই লাভ করেছে মন ও মানসের গভীর তৃপ্তি ও স্বস্তি। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রকৃতি প্রবণতা অনুযায়ী বিশ্বলোকে জীবনের ও জীবের উন্মেষ ও

১. ডারউইনীয় বিবর্তনবাদের তত্ত্ব ও তার অসারতা ও অবৈজ্ঞানিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে মৎ প্রণীত 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব' গ্রন্থে।

অস্তিত্বের রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক ব্যাখ্যা লাভ করেছে। লাভ করেছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রমাণের আচ্ছাদনে, তাতে যত ফাঁক ও ফাঁকিই থাকুক না কেন, সেদিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করারও প্রয়োজন তারা বোধ করেনি; বরং তাকে উপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করেছে।

সেকিউলারিজম মতাদর্শভিত্তিক এ ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ বর্তমান সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ কারণে আজকের মানুষের নিকট আবহমানকালের মানবতা, মনুষ্যত্ব এবং নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা নিতান্ত মূল্যহীন বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মানুষ জীব মাত্রে— উন্নত আকৃতিসম্পন্ন পশুতে— পরিণত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আত্মপ্রকাশ করেছে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের চিন্তাধারা। সে চিন্তা ও মত অনুযায়ী মানুষ মূলতই একটি 'বস্তুগত যন্ত্র' মাত্র। এখানে দেহ ও প্রাণশক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বলতে কিছুই থাকল না। কেননা উক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'প্রাণ' কোন স্বতন্ত্র সত্তারূপে গণ্য নয়, তা বস্তুরই বিবর্তনের একটি পর্যায় মাত্র। পাশ্চাত্যের 'সেকিউলার' বিজ্ঞান— আল্লাহ অস্বীকারকারী জড়বাদী বিজ্ঞান 'রূহ' বা প্রাণশক্তিকে এড়িয়ে এবং তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করেই সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছে। আর পুঁজিবাদের ব্যাখ্যায় কার্লমার্কস বলেছে যে, পুঁজিপতিরা শিল্পের আমল ও মৌলিক মুনাফা নিজেরাই কুক্ষিগত করে। তাই বঞ্চিত শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে এ উৎপাদন ব্যবস্থাকে খতম করে, পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদকে উৎখাত করে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নেবে বলে এক ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।

ডারউইন, ফ্রয়েড ও কার্লমার্কসের পূর্বোদ্ধৃত চিন্তাধারাই বর্তমান পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনের ভিত্তিপ্রস্তর। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদ ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি এই চিন্তাধারার আঘাতে সদা কম্পমান। মার্কসের কমিউনিজম তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে প্রতিষ্ঠিত না হলেও পুঁজিবাদী অর্থনীতি তার আসল রূপ হারিয়ে ফেলে সমাজতন্ত্রের অনেকখানি কাছে এসে গেছে। আর রাজনৈতিক গণতান্ত্রিকতা অনেকখানি সমাজতান্ত্রিক

স্বৈরতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেকিউলারিজম-এর মতাদর্শ এসব দেশেই সমাজের ভিত্তি হিসেবে অভিন্নভাবেই স্বীকৃতি পেয়েছে।

বস্তুত মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যে জিনিসকে 'স্বাভাবিক' বলে মনে করে, বাস্তব জীবনে তাকেই সত্য করে তোলে। এটাই হলো মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। ডারউইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব দুর্বলের ধ্বংস ও বিলয় এবং সবল ও শক্তিমানের উর্দ্বতন অনিবার্য করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ এবং তার ফলাফলকে অতীব স্বাভাবিক পরিণতি রূপে গণ্য করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতেই মানুষের বাস্তব জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি, শ্রেণী ও জাতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামকে অত্যন্ত স্বাভাবিক, যথার্থ ও কাম্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে। আর এর পরিণামে শক্তিমানের বিজয় ও উর্দ্বতন এবং দুর্বল-শক্তিহীনের পরাজয় ও অবলুপ্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত বলে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে। এর কোন একটি ক্ষেত্রে একবিন্দু অস্বাভাবিকতা অনুভূত নয় পাশ্চাত্য সমাজের নিকট। এক কথায় 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি শাশ্বত ও চরম সত্য বিধানরূপে পাশ্চাত্য সমাজের নিকট চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কিন্তু আবহমান কালের পরম সত্য ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের দৃষ্টিতে তা নিতান্তই অন্যায়, জুলুম ও স্বভাব পরিপন্থী কার্যকলাপ রূপে প্রমানিত। সে দৃষ্টিকোণে সব মানুষই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, সকলেই সমান মর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন। শক্তিমানের হস্তে দুর্বলের স্বার্থহানি অবৈধ ও অতি বড় অপরাধ। মূল্যমানের দিক দিয়ে তা অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং কার্যত অবশ্য পরিত্যাজ্য।

ডারউইনের ক্রমবিকাশতত্ত্বের আলোকে মানুষ তার পাশবিক পূর্ব পুরুষদের স্বভাব গ্রহণ করেছে। চারদিকে পশুসুলভ রীতিনীতির আইন-কানুন চালু হওয়া তারই অনিবার্য পরিণতি। বর্তমানের পাশ্চাত্য জাতিসমূহ জাতিসংঘের সমস্ত আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এসব আইনের অধীনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। ন্যায় বা অন্যায়, শোভন বা অশোভন, জুলুম বা ইনসাফ প্রভৃতির প্রশ্ন তাদের নিকট কোন গুরুত্বই পাচ্ছে না। বঞ্চিত, নিপীড়িত ও দুর্বল জাতিগুলোর ফরিয়াদ আকাশ-বাতাসকে মথিত করে তুলেছে। কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত করার কেউ নেই। প্রবল ও পরাশক্তিগুলো 'খায়ও এবং

হুংকারও ছাড়ে' আর ভোটদানের সময় নিপীড়িত জাতিগুলোকে বড় বড় অত্যাচারী জাতিগুলোর পক্ষে রায় দিতেও বাধ্য করছে। তা না দিলে তাদের পরিণামও অত্যন্ত ভয়াবহ হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। প্রত্যেকটি বৃহৎ শক্তি অপর বৃহৎ শক্তির পক্ষেই কাজ করে। বাহ্যিকভাবে বক্তৃতা-ভাষণে যত বিরোধই দেখানো হোক, আসল কাজে তাদের সকলেরই ভূমিকা সম্পূর্ণরূপেই অভিন্ন। কোন বৃহৎ শক্তি অপর কোন দুর্বল শক্তির পক্ষে কাজ করলেও তা করে তাকে সমূলে ধ্বংস করার— তাকে চূড়ান্তভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে। তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বেঁচে থাকার সুযোগদানের লক্ষ্যে নিশ্চয়ই নয়। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা এদিক দিয়ে খুবই তিক্ত।

ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক মতাদর্শে তো স্পষ্ট ভাষায় মানুষকে এক 'যৌন আবেগসর্বস্ব জন্তু' বানিয়ে দেখানো হয়েছে। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও একান্তই সাধারণ ব্যাপাররূপে পেশ করে নৈতিক বিধিনিষেধ, বাধা-বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণকে নিতান্তই অনভিপ্রেত এবং মনস্তাত্ত্বিক জঠিলতার কারণ বলে চিহ্নিত করেছে। ধন-ঐশ্বর্যে মদমত্ত পুঁজিবাদীদের এটাই ছিল কাম্য। ফলে চারদিকে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নির্বিশেষে নারী-পুরুষের দৈহিক মিলন জনিত ব্যাভিচারের প্লাবন বয়ে গেল। এর পূর্বে পাশ্চাত্য দেশসমূহের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন প্রাচ্য দেশীয় পরিবার ও দাম্পত্য জীবনের মতোই সুস্থ ও পবিত্র ছিল। ভিন্ পুরুষের সাথে ভিন্ নারীর গোপনে মিলিত হওয়া প্রাচ্য দেশের মতোই দূষণীয় ও অবাঞ্ছিত ছিল। সেখানে যুবতী মেয়েরা কোন আত্মীয় পুরুষ বা নারীর সঙ্গ ছাড়া ঘরের বাইরে যাতায়াত করতে পারত না। কিন্তু ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক মতাদর্শ পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষকে বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মতোই উদ্দাম ও উত্তাল করে দিয়েছে, অবিবাহিত নারী-পুরুষের পারস্পরিক প্রেম বিনিময় একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। মেয়েরা এখন আর ঘরের রাণী হয়ে থাকতে প্রস্তুত নয়, তারা এখন সভা-সম্মেলনের প্রদীপ শিখা, মঞ্চের গায়িকা, নৃত্যরতা শিল্পী আর অফিসের রিসিপসনিস্ট, বড় সাহেবের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী, কর্মচারীদের সহকর্মিণী, টাইপিস্ট, স্টেনো এবং দোকানের বিক্রয়কারিণী (Sales girls) ইত্যাদি ইত্যাদি। স্ত্রী এখন স্বামীর একক

শয্যা-সঙ্গিনী নয়, বন্ধু ও প্রিয়জনকে আপ্যায়নের সামগ্রী বিশেষ। স্বামীদের পক্ষে এটা যেমন একটা গৌরবের ব্যাপার, তেমনি স্ত্রীদের জন্যেও কম গৌরবের ব্যাপার নয় বহু ভোগ্য হওয়া। কুমারীরা মা হতে এবং মা রূপে সমাজে পরিচিতা হতে এখন আর কোন লজ্জা বা সংকোচ বোধ করে না, সামাজিকভাবে নয় তারা ঘৃণিতা বা লাঞ্ছিতা। বরং বৈধ মা'দের অপেক্ষা তারা কিছুমাত্র কম সম্মানিতা নয়। কেননা ফ্রয়েডের দর্শন সব দ্বিধা, সংকোচ, লজ্জা বা অন্যায়বোধের অবসান ঘটিয়েছে। অবৈধ সন্তানের উৎপাদন বর্তমানে খাদ্য উৎপাদনের চাইতেও অধিক উন্নতির পথে। ফ্রয়েডীয় দর্শনের এটাই বড় অবদান।

ধন-সম্পদের অসম বণ্টন, পুঁজিপতিদের অমানুষিক শোষণ, বিলাস-ব্যসন, লালসা-চরিতার্থতা ও বিলাসী জীবন-যাপন, সুখ-সম্ভোগ গরীবদের অনশন ও দুঃখ-দারিদ্র এবং নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের প্রচণ্ড অভাব কার্লমার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের জন্যে সহায়ক ও অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। শ্রমিক শ্রেণীর অসহায় অবস্থা যখন চরমে, তখন তারা ক্রুদ্ধ-বিক্ষুব্ধ হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং সব রকমের বাধা-বন্ধনকে চূর্ণ করে বন্য হিংস্র পশুর মতো এমনভাবে হুংকার দিল যে, পুঁজি ও পুঁজিদারদের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা ও ধর্মের সব নিয়ম-কানুন ও মূল্যবোধকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। রাশিয়ার রক্তাক্ত বিপ্লব কত নিরীহ মানুষের তাজা টাট্‌কা রক্ত ঝরিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও কত ঝরাবে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। ১৯১৭ থেকে যে নির্মম রক্তপাতের ধারা শুরু হয়েছে, বর্তমানে দুনিয়ার অন্য বহু সংখ্যক দেশে সেই ধারাই চলছে অব্যাহতভাবে। যে হিংসা, আক্রোশ ও শত্রুতা-জিঘাংসা দিয়ে সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল, তা দুনিয়ার দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের রক্তের বন্যা প্রবাহিত করে চলেছে। তবু মার্কসীয় দর্শনের রক্ত পিপাসা এখনও নিবৃত্ত হয়নি।

বর্তমান দুনিয়া এমন একটি কারখানায় পরিণত হয়েছে, যেখানে মালিক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক শ্রেণী মুখোমুখী হয়ে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার কঠিন দ্বন্দ্ব সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। কোন পক্ষই অপর পক্ষের নিকট

একবিন্দু নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, কোন পক্ষই উন্নত নৈতিকতা, মানবিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যমানের প্রতি একবিন্দু শ্রদ্ধা জানাতেও আগ্রহী নয়।

ডারউইন ও ফ্রয়েডীয় দর্শন তাদের এসব বন্ধন ও বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিয়েছে। আর কার্লমার্কসের শ্রেণী সংগ্রামের দর্শন বিশ্ব কারখানায় 'বিশ্ব ধর্মঘট' করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকটি দেশের জনগণ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক ভাগের লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে রাশিয়া। আর অপর ভাগের আসল প্রভু বা মন্ত্রণাদাতা হচ্ছে আমেরিকা। আর তারই অনিবার্য পরিণতিতে প্রায় প্রত্যেকটি দেশে 'রুশপন্থী' আর 'মার্কিনপন্থী' পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে তুলেছে।

বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরে যে দলাদলি ও সংঘর্ষ চলছে, তার পেছনে এই পরাশক্তিগুলোর হাত রয়েছে নিশ্চিতভাবে। এসবের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন ও ধন-সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। একথা নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে যে, স্থানীয় সংঘর্ষ ও সংঘাত মূলত স্থানীয় নয়, তা দুনিয়ার পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ শক্তিবর্গেরই কারসাজি। দুনিয়ার বহু ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতি বৃহৎ শক্তিবর্গের মানবতা বিধ্বংসী চাল ও চক্রান্তে পড়ে পয়মাল হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মানুষের রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে দেখে— না স্থানীয় মানুষের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসছে, না বৃহৎ শক্তিবর্গের অন্তরে কোনরূপ দয়া-মায়ার উদ্রেক হচ্ছে। তারা নিত্যনতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার ও নির্মাণ করে, তার ভয়ে ভীত করে প্রাচ্যের লোকদের ওপর তাদের নিজস্ব মতাদর্শ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চাইছে। বিশ্ব মানবতার প্রতি পাশ্চাত্য সভ্যতার এটাই হচ্ছে বড় অবদান। আর এ সভ্যতার ভিত্তি রচিত হয়েছে এ গ্রন্থে আলোচিত চিন্তা ও দার্শনিক মতবাদসমূহের ওপর। এই বিষয়ে বাংলা ভাষাভাষীদের সচেতন করাই এই গ্রন্থের লক্ষ্য। আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা সুধী পাঠকবৃন্দেরই বিচার্য।

সেকিউলারিজম

'সেকিউলারিজম' ল্যাটিন শব্দ saecularis থেকে উদ্ভুত। তার অর্থ বৈষয়িক (Worldly) অস্থায়ী (Temporal) এবং প্রাচীন (Old age)। গীর্জার কোন পাদ্রী যদি বৈরাগ্যবাদী খানকাহী জীবন পরিহার করে বৈষয়িক জীবন যাপনের অনুমতি লাভ করে তাহলে তাকে 'সেকিউলার' নামে অভিহিত করা হয়।

পারিভাষিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে তা একটি মতাদর্শ, একটি বিশেষ ধরনের কার্যক্রম। তাতে যাবতীয় দ্রব্যাদি, বস্তু নিচয় এবং মানুষকে এই পার্থিব জগত পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা হয়। বাংলা ভাষায় 'সেকিউলারিজম'-এর অনুবাদ করা হয় 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' অথবা 'বৈষয়িকতাবাদ' কিংবা 'ধর্মহীনতাবাদ'। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ইচ্ছা ও সমর্থনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে রাষ্ট্র তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তিকে নিতান্ত বৈষয়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার লক্ষ্যে করায়ত্ত করে নেয়ার রক্তাক্ত ইতিহাসই তার উৎপত্তি— উৎস। ইতিহাসে এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত অগণিত। 'সেকিউলারিজম'-এর আরও অধিক বিস্তৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ স্বরূপ বলা যায়, মানব জীবনের বিভিন্ন উপাদান ঝোঁক-প্রবণতা, রসম রেওয়াজ এবং অন্যান্য সামাজিক রূপ তথা স্বয়ং মানুষের জীবনকে কোন ধর্মবিশ্বাসের ওপর ভিত্তিশীল না করাকেই বলা হয় 'সেকিউলারিজম'। ধর্ম বিবর্জিত জীবনধারা (Adulthood) অবলম্বনই হচ্ছে 'সেকিউলারিজম'। এক কথায় তা একটি বিশেষ মতাদর্শ (Ideology) রূপে গড়ে ওঠার জন্য ব্যর্থ চেষ্টায় রত।

'সেকিউলারিজম'-এর উৎপত্তি ইউরোপে। ঊনবিংশ শতকে একজন ইংরেজ চিন্তাবিদ 'সেকিউলারিজম'-কে একটা বিশ্বজনীন আন্দোলনে রূপায়িত করার চেষ্টা চালায়। এরা নিজদের 'সেকিউলারিস্ট' 'বৈষয়িকতাবাদী'— 'ধর্মবিমুক্ত চিন্তাবিদ' পরিচিতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন জি. জে হলিউক (১৮৫৪ খ্রিঃ)। তার মতে 'সেকিউলারিজম' হচ্ছে জনগণের কর্মদর্শন। secularization

শব্দটি প্রথমবারে একটি আইনগত পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। যে সব বিশেষ আন্দোলন ১৬৪৬-এর ত্রিশ বর্ষীয় যুদ্ধাবসানকালে সরকারের সাথে আলাপ আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছিল এবং যার ফলে Treaty west phalia জনগণের সম্মুখে প্রকাশমান হয়েছিল এবং অষ্টাদশ শতক থেকে যা Canon-law রূপে গৃহীত হয়েছিল, তারই ফলে এই পরিভাষাটির উদ্ভব এবং প্রচলন হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গীর্জাকে যখন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ওপর বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বস্তুগত কল্যাণের ব্যাপারাদির ওপর প্রভাব বিস্তার করা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছিল, তখন Secularization-এর তাৎপর্যে ব্যাপকতা ও গভীরতার সৃষ্টি হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। ফ্রান্সে তখন Secularization-কে একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শনরূপে গ্রহণ করা হয়। আর তার নাম দেয়া হয় Laicism— ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভ। কিন্তু ইংলন্ডে এই দর্শনের নাম দেয়া হয় 'সেকিউলারিজম' (Secularism)। উভয় পরিভাষাই ধর্মের প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থীরূপ পরিগ্রহ করে। অস্তিত্ববাদী, বস্তুবাদী ও অভিন্ন মৌলবাদী (monism) বা অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসীরাও এই পরিভাষাদ্বয়কে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে।

একালের কিছুসংখ্যক চিন্তাবিদ 'সেকিউলারিজম' ও 'সেকিউলারাইজেশন'— এই পরিভাষাদ্বয়ের তাৎপর্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। 'সেকিউলারিজম'কে একটা মিথ্যা মতাদর্শরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আর ইংরেজী ভাষাভাষী দেশসমূহে 'সেকিউলারাইজেশন' ষষ্ঠদশ শতকের সেই ঐতিহাসিক স্বৈরতন্ত্র বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অধীন অষ্টম হেনরী সরকার সমস্ত খানকাহ[১] বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল। ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়েই কোন না কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী কিংবা রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিজয়ী ধর্মীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে প্রত্যাখ্যান করে ধর্মীয় অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে চলেছে এবং তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে চেষ্টা চালিয়েছে। এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা মূল ধর্মের মতোই প্রাচীন। এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও প্রবণতা নিজ নিজ অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ

১. খানকাহ্ বা আশ্রম যেখানে বৈষয়িক জীবন ত্যাগকারী লোকেরা ধ্যান তথা ধর্ম পালনে রত থাকেন।

পরিগ্রহ করেছে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে মিশরীয় ফেরাউন আখ্-ইন-আতুন (Akh-en-aton) একটি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থার খাতিরে স্বীয় সাম্রাজ্যের পরিসীমার মধ্য থেকে ঐতিহ্যবাহী উপাস্য দেবদেবীর ও পূজা-উপাসনার নিয়মাদি নির্মূল করে দিয়েছিল। তাছাড়া জীনোফিনিজ ও এন্ ইক্জাগুরাস থেকে শুরু করে সক্রেটিস পর্যন্তকার গ্রীক দার্শনিকগণ এবং পরে এপিকিউরিন নিজ সময়ের সব দেবদেবী ও দেবমালা পর্যায়ের ধারণাসমূহের যে তীব্র সমালোচনা করেছে তা-ও সর্বজনবিদিত। ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত বিদ্যার ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়, প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস ও আদেশ-উপদেশকে একটি সংকীর্ণ শ্রেণীর লোকেরা সবসময়ই সন্দেহ ও সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখেছে। বাহ্যিকভাবে ও বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধার কারণে তারা ধর্মকে হয়ত সম্পূর্ণ অস্বীকার করেনি, কিন্তু একটি প্রশ্নহীন ও সংশয়মুক্ত অন্তর দিয়ে তা তারা কখন-ই গ্রহণও করেনি। বাস্তব জীবনের প্রতিপদে তাকে জড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করেছে।

মূলত 'সেকিউলারাইজেশন' (Secularization) এবং সেকিউলারিজম (Secularism)-এর মধ্যে মৌলিক ও তত্ত্বগত কোন পার্থক্য নেই। উভয়দিকেই 'নিতান্ত বৈষয়িক আদর্শ' বলতে কিছুমাত্র ভুল বলা হবেনা, 'সেকিউলারিজম' বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত একটি বিরল ও অস্থায়ী মতাদর্শরূপেই বিরাজমান।

যে সময়ে এই মতাদর্শটির উৎপত্তি ঘটে, তখন দুনিয়া ও মানুষের ব্যাখ্যা দেয়া হতো অত্যন্ত স্থবির ধরনের দেবমালা সঞ্জাত ভঙ্গিতে। সমস্ত সামাজিক রীতিনীতি ও ব্যবস্থা ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এমনকি প্রাকৃতিক শক্তি ও উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যাদুমন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা হতো। তা-ও ছিল ধর্মের একটা বিকৃত রূপ।

সেকিউলারিজম-এর দুটো দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি হচ্ছে, তা জনগণের বৈষয়িক জীবনকে উন্নত বানাতে আগ্রহী। আর এটাই তার নৈতিক দিক। কেননা নৈতিকতা সম্পর্ক সমাজের মধ্যকার এমন সব কাজের সাথে, যে সবের সাথে লাভ ও লোকসানের কোন-না-কোন সম্পর্ক থাকে। কিন্তু 'সেকিউলারিজমে' এই পর্যায়ের কার্যাবলীর ভিত্তি কোন ধর্ম বা পরকাল বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত নয়। ফলে

তা ধর্মকে অস্বীকার করেও ধর্মের লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট। অন্যকথায় ইতিবাচকভাবে তা একটি নৈতিক আন্দোলন বিশেষ। কিন্তু নেতিবাচকভাবে তা একটি 'ধর্মীয় আন্দোলন'ও বটে। তার উৎপত্তি লাভে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক অবস্থা ও দার্শনিক প্রভাব বিশেষ সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়েছে।

সেকিউলারিজম-এর বিকাশ

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের সংস্কারমূলক বিল-এর পূর্ব ও পরবর্তীকালীন অস্থিরতা বিপর্যয় ও দাংগা-হাঙ্গামার ফলে এই মতবাদটির উৎপত্তি ঘটে। তার অন্তঃস্থিত বস্তু অনেকটা রবার্ট ঊন এবং তার অনুসারীদের অবিন্যস্ত ও সম্পর্কহীন সমাজতন্ত্র এবং ভাগ্যাহত চার্টিস্ট আন্দোলনের ফসল। তা চরমপন্থী চার্টিস্ট ও ইউরোপীয় মহাদেশে সৃষ্ট বিভিন্ন বিপ্লবের দরুন জনমনে জেগে ওঠা বিপ্লবাত্মক আশা-আকাঙ্ক্ষার চরম ব্যর্থতার পর ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে উদ্ভূত হয়েছিল। সেকিউলারিজম সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশকে সংগঠন ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ উপায়ের সাহায্যে অগ্রসর করে নেয়ার একটা কার্যক্রম ছিল।

অস্বীকার করার উপায় নেই, অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও তীব্র ধরনের সামাজিক বিপর্যয়ের পরিণতি স্বরূপ 'সেকিউলারিজম'-এর উদ্ভব ঘটেছিল। ধনশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন লোকদের লালসা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার পথে অযৌক্তিক ও অসঙ্গত প্রতিবন্ধকতা এবং গীর্জীয় ধর্মতত্ত্বের বন্ধ্যা অহমিকতা প্রভৃতি উপাদান 'সেকিউলারিজম' সৃষ্টির নিমিত্ত হয়েছিল। এরই ফলে শ্রমজীবী শ্রেণী যখন অবস্থার চরম অবনতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, তখন তাদের মধ্যে শুধু যে চরমবাদী রাজনৈতিক মতবাদই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তা-ই নয়, ধর্ম বিদ্বেষ ও ধর্মের প্রতি মারাত্মক প্রতিহিংসামূলক প্রবণতাও জন্মলাভ করে, তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

'সেকিউলারিজম' মূলগতভাবে একটি প্রতিবাদ ও বিক্ষোভমূলক আন্দোলন ছিল। আর সমস্ত বিক্ষোভমূলক আন্দোলনই ভাবাবেগ সৃষ্টিকারী শক্তির সাহায্য নিয়ে বিশেষ ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে, তা-ই তার প্রকৃতি। এই কারণে তাতে অনিবার্যভাবে বহু প্রকারের দোষত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে যায়। তাতে ভারসাম্যহীনতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। গঠনমূলক

ভাবধারার পরিবর্তে বিপর্যয়কর কার্যক্রমের প্রবণতা প্রবল হয়ে থাকে। দ্বিগুণ চারগুণ ভাবালুতার বিভ্রান্তিকর প্রয়োগ, দৃষ্টি সংকীর্ণতা ও নেতিবাচক আচরণ প্রভৃতিই এসব আন্দোলনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। আর প্রচলিত আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তা আত্মপ্রকাশ করে। 'সেকিউরারিজম' যদিও একটি ইতিবাচক নীতি অনুসরণ ও উপস্থাপনের চেষ্টা চালিয়েছিল; কিন্তু এই ইতিবাচক নীতি চিন্তার একটি বৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়ে গেছে। সেকিউলারিজম'-এর দৃষ্টি সংকীর্ণতার মূলে বিশেষ কারণ নিহিত। আর তা হচ্ছে, জীবন ও কর্ম পর্যায়ে বেশিরভাগ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে তা প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষের অস্ত্র ব্যবহার করেছে। জীবন ও কর্মের গুরুত্ব খুব সামান্যই স্বীকৃত হয়েছে।

'সেকিউলারিজম'-এর দার্শনিক ভিত্তি জেম্‌স্ মিল ও জিরামী বেনহাম-এর শরীকানাবাদী চিন্তাপদ্ধতি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। তার একটা নিজস্ব ধর্মবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। পাইন ও রিচার্ড কারলাইল তা-ই লাভ করেছিল উত্তরাধিকারসূত্রে। 'সেকিউলারিজম'-এ ইতিবাচকতার প্রভাব ইংরেজদের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও 'সেকিউলারিজম' সে ইতিবাচকতার প্রতি আদৌ কোন ভ্রূক্ষেপ করেনি, তার প্রতি আরোপ করেনি একবিন্দু গুরুত্ব। মানবতাকে দেবতার আসনে আসীন না করলেও নিজের মধ্যে ইতিবাচক শিক্ষাদর্শনের সংমিশ্রণ করে নিয়েছে। 'সেকিউলারিজম্'-এ এই প্রভাব জি. এইচ. লিউস. ও জে. এস. মিল থেকেই আমদানী করা হয়েছিল। 'সেকিউলারিজম্' যখন মিল্-এর সম্মুখে পেশ করা হলো, তখন সে তাকে সত্যতার সনদ দানে ধন্য করে দিল। অনুরূপভাবে দার্শনিকতার দিক দিয়ে বৃটেনীয় সুবিধাবাদ তার আধ্যাত্মিক গুরু প্রমাণিত হয়েছে। যে সব তিক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কারণে এ আন্দোলনের মূল হোতাগণ সমসাময়িক সার্বজনীন মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, তা-ই ছিল এই 'সেকিউলারিজম' আন্দোলনেরও মৌল কারণ, কিন্তু তার অন্তঃস্থিত প্রভাব ছিল দার্শনিক ধরনের। আর তা হওয়াও ছিল একান্তই অনিবার্য। কেননা 'সেকিউলারিজম' যখন প্রকাশ্যভাবে ধর্মের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল, তখন তা জীবন ও কর্ম পর্যায়ে একটা নতুন দার্শনিক মতাদর্শ গড়ে তুলেছিল। বিশেষভাবে নৈতিকতার পর্যায়ে এই দর্শন ছিল অত্যন্ত

প্রকট। এই মতাদর্শই 'সেকিউলারিজম'কে তার কাঙ্ক্ষিত ভিত্তি সংগ্রহ করে দিয়েছিল।

সেকিউলারিজম্-এর উদ্ভাবক

'সেকিউলারিজম' তার নামকরণ ও সত্তার দিক দিয়ে অনেকটা জর্জ জ্যাকব হলিউক-এর নিকট অনুগ্রহ ঋণের জালে বন্দী। হলিউক ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে বার্মিংহামে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার পিতা ছিল কঠোর পরিশ্রমী হস্তশিল্পী। গোঁড়া ধর্মীয় পরিবেশে তাঁর লালন-পালন সম্পন্ন হয়েছিল। তার জন্মভূমির পরিবেশ ও বাল্যকালীন পারিপার্শ্বিকতা তার মধ্যে তীব্র ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক আকীদার জন্ম দেয়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের সংস্কারমূলক বিল পাশকরণ জ্বলন্ত আগুনে তেল ঢালার কাজ করে। তখন হলিউক ছিল পঞ্চদশ বছরের এক সংবেদনশীল কিশোর। ফলে তার মন গীর্জার প্রতি অনাস্থাভাজন হয়ে পড়ে। কেননা গীর্জা সাধারণ মানবিক সংবেদনশীলতা ও অনুকম্পাপরায়ণতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিল। সে উঊনের সমাজ সংস্কারক ও প্রচারক হিসেবে রাজনৈতিক জীবনে সর্বপ্রথম পদার্পণ করে। অতঃপর চার্টিজম (Chartism)[১]-এর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে চার্টিজম-এর আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে হলিউক চরমপন্থী (radical) মৌলবাদী চিন্তার ধারকের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে সে দৃঢ় নিশ্চয়তা সহকারে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে, পরে 'চেশটনহাম' নামক স্থানে তাকে 'কাফের' আখ্যায়িত করে গ্রেফতার করা হলে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তার ঘৃণা অধিকতর তীব্র, গভীর ও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। কিন্তু হলিউক তার সমসাময়িক বিশ্বাসগত নাস্তিকতাবাদের প্রতিও কোন সহানুভূতি পোষণ করত না। তার নাস্তিকতা ছিল 'আমি জানিনা' পর্যায়ের। সে তার স্বতন্ত্র ধরনের চিন্তাধারার প্রকাশ ও প্রচার করেছিল অসংখ্য পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। 'The Reasoner' পত্রিকায় সে লিখেছিল ঃ

'আমরা কাফের নই যদি এই পরিভাষাটির প্রয়োগ খ্রিস্টীয় তত্ত্ব অস্বীকৃতির উপর হয়, তাহলে বলব, আমরা সকলে খ্রিস্ট ধর্ম সৃষ্ট ভ্রান্তিমূলক রীতিনীতি আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করছি।' সে সব খ্রিস্ট ধর্ম সৃষ্ট ভ্রান্তিমূলক

১. চার্টিজম ঃ গ্রেটবৃটেনের ১৮৩৭-৪৮ সালে সংস্কার আন্দোলন নীতি।

রীতিনীতি আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করছি। যে সব খ্রিস্টান ব্যক্তি রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তায় তার সাথে একমত ছিল হলিউক তাদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে রেখেছিল। মুরাঈম ও কিংস্লে'র 'ক্রিশ্চিয়ান স্যোশ্যালিজম'-এর দিকে তার ঝোঁক তাদের সাথে একাত্মতার নিশ্চয়তা বিধান করছিল। কিন্তু প্রকৃত সমাজতন্ত্রের মতাদর্শগত বিশেষত্বের দরুণ তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই কারণে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে খ্রিস্টবাদের সংমিশ্রণকে সে অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করত। হলিউক কয়েক বছর ধরে জনকল্যাণমূলক ও সমবায়ী আন্দোলনের সাথে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। মধ্যম বয়স থেকে একজন পুস্তক ব্যবসায়ী হিসাবে লন্ডনের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে থাকতে শুরু করে। এই সময়ে ইটালীর স্বাধীনতাই হয়েছিল তার অবসরহীন ব্যস্ততা ও গভীর আন্তরিকতার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। জীরেমী বান্ডমি ও মীজেনী উভয়ই ছিল তার ঘনিষ্টতম বন্ধু। যে সব হতভাগ্য ইংরেজ সিপাহীকে ইটালীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের প্রশিক্ষণদানে সে তখন সর্বান্তঃকরণে ও সার্বক্ষণিকভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকত। জীবনের শেষভাগে সে ব্রাইটনে বসাস শুরু করে এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এখানেই তার জীবনের অবসান ঘটে। এই বছরের শুরুতে অনুষ্টিতব্য সাধারণ নির্বাচনের সে ছিল সক্রিয় সমর্থক এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বাধীন চিন্তার বিজয়ের সুসংবাদ শ্রবণের জন্যে সে হয়েছিল অত্যন্ত ব্যাকুল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেসব লোক খ্রিস্টান বিরোধী প্রচারণাকে প্রচণ্ড ঝাটকার ন্যায় পরিচালনা করেছিল, হলিউক তার দীর্ঘ জীবনে তাদের সকলের সাথে গভীর সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই সে খ্রিস্টবাদের প্রখ্যাত প্রচারকবৃন্দের সাথেও সম্পৃক্ত রয়েছে। ডব্লিউ, ই. গ্লেডেস্টোন এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সে হলিউককে একজন স্বতন্ত্র ধরনের বিশ্বস্ত বিরোধী ব্যক্তি বলে মনে করত। চার্লস্ ব্রেডলাফ (Charles Bradlaugh)-এর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হলিউকের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। (তার অর্থ, ধর্মের মৌলিকতার বিরুদ্ধে তার ঘৃণা ছিল না। তার ঘৃণা ছিল ধর্মের বন্ধ্যা গীর্জীয় প্রকাশের বিরুদ্ধে) তার দলের বিপুল সংখ্যক সদস্য তার বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছিল, তা ছিল হলিউকের স্পষ্ট ও দ্বিধামুক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জীবন্ত প্রমাণ।

'সেকিউলারিজম্'কে প্রতিষ্ঠিত করণ প্রচেষ্টায় হলিউকের সহকর্মীদের মধ্যে চার্লস সাউথ ওয়েল, থমাস কুপার (পরে সে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল), থমাস পিটার্সন ও উইলিয়াম বিল্টন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। হলিউক এই আন্দোলনকে নাস্তিকতাবাদের 'উত্তম বিকল্প' বলে অভিহিত করেছিল। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ব্রেডলাফ এর সাথে হলিউকের সাক্ষাৎ হয় এবং ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে সে 'সেকিউলারিজম' পরিভাষাটি রচনা করে। সে netheism limitatonism কে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে চলেছে। অথচ নিজেদের বিশেষত্বের দিক দিয়ে এই দুইজন নাস্তিকতাবাদের 'উত্তম বিকল্প' হওয়ার অধিক অধিকারী ছিল। 'সেকিউলারিজম' পর্যায়ে তার বক্তব্য ছিল 'এটি বর্তমান জীবনের আওতাভুক্ত কর্তব্যসমূহ উত্তমভাবে পালনের মতাদর্শ।' হলিউক 'সেকিউলারিজম'-এর ধর্মবিরোধী মর্যাদাও ব্রেডলাফ-এর নাস্তিকতাবাদী মতাদর্শসমূহের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য প্রকাশ করেছে। যদিও চার্লস ওয়াটস্, জি ডাব্লিউ ফিট ও অপরাপর ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এই 'সেকিউলার' আন্দোলনের ফলেই বহাল রয়েছে। কিন্তু হলিউক সবসময় চেষ্টা চালিয়েছে এজন্যে যে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিকতার লক্ষ্যে নাস্তিকতাবাদী বিশ্বাসকে জরুরী শর্তরূপে কখনই যেন গণ্য করা না হয়। তা হলেই 'স্বাধীন মুক্ত চিন্তার ধারক ব্যক্তিবর্গ' নিজেদের নাস্তিকতাবাদের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষী মনোভাব ছাড়াই— সেই লক্ষ্যসমূহকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার সাথে ঐকান্তিকভাবে শামিল থাকতে পারবে। এই আবরণের ক্ষেত্রে তার বড় ধরনের সাফল্য লাভ না হলেও সে অত্যন্ত কঠোরতা ও অবিচলতা সহকারে এই নীতিকেই সচল রাখতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল।

সেকিউলারিজম-এর মৌলনীতি

সেকিউলারিজম-এর মৌলনীতি হচ্ছে, মানুষের বৈষয়িক উন্নতির জন্যে শুধুমাত্র বৈষয়িক বা পার্থিব উপায় উপকরণের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করতে হবে। কেননা বৈষয়িক উপায় উপকরণ মানুষের করায়ত্ত হওয়ার কারণে অন্যান্য সব কিছুর তুলনায় অধিক গুরুত্ব পাওয়ার অধিকারী। তা ছাড়া এই উপায় উপকরণসমূহ মানুষের কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় সবকিছু

অর্জনে অধিক উন্মুক্ততা সহকারে ব্যবহৃত হতে পারে। 'সেকিউলারিজম' একটা প্রবল মতাদর্শ হিসেবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল সেই সময়ে যখন বিজ্ঞান ও ধর্মের বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কহীনতার দাবি অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করেছিল। সেকিউলারিজম-এর মত ছিল এই দাবির সাথে পুরামাত্রায় সংগতিপূর্ণ। সে কারণে 'সেকিউলার তত্ত্বসমূহকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। চলমান জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপরই রক্ষিত হয়েছিল 'সেকিউলারিজম'-এর ভিত্তি। সেই সাথে দাবি তোলা হয়েছিল যে, তাকে বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতার আওতায় নিয়ে আসা যায় অতীব সহজভাবে। মনে করা হয়েছে, অংক ও গণিতবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্র যেভাবে''সেকিউলার' বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত, অনুরূপভাবে একটি কল্যাণমূলক জীবন ও মানবীয় কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে 'সেকিউলার' দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। আর এই পদ্ধতিতেই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ধারাকেও সচেতন পথ নির্দেশনায় সংযোজিত করা চলে।

এই কারণে ধর্মের সাথে 'সেকিউলারিজম্-এর সম্পর্ক পারস্পরিক শত্রুতামূলক হওয়ার পরিবর্তে ভিন্নতর ও একক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্মতত্ত্ব অদৃশ্য জগতের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে আর 'সেকিউলারিজম' অদেখা জগত ও তার ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। বাস্তব অভিজ্ঞতার আওতাভুক্ত জগতের সঙ্গেই সম্পর্ক সেকিউলারিজমের। পরকালীন জীবন পর্যায়ে তার কিছুই বলবার নেই— না তার পক্ষে ইতিবাচকভাবে, না তার বিপক্ষে নেতিবাচকভাবে। এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান কিংবা নাস্তিকতা— এর কোনটি সেকিউলারিজম্-এর অংশ নয়। কেননা বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ দুটির প্রমাণ করা যায় না বলে সেকিউলারিজম্-এর ধারণা। অবশ্য ধর্মতত্ত্বের নৈতিক শিক্ষার সাথে তার একটা সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু সে জন্যে বিশ্বাসের বিষয় উপস্থাপিত করে, তা ধর্মীয় বিশ্বাসের আওতাভুক্ত নয়। সে সব লোক বিভিন্ন কারণে ধর্মতত্ত্বের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস স্থাপনে সক্ষম হচ্ছে না। 'সেকিউলারিজম' কেবল তাদেরই মহা আকর্ষণের জিনিস। 'সেকিউলারিজম্' এর দাবি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতা কেবলমাত্র সেকিউলার চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। যেমন রাজমিস্ত্রী যে সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ কাজ করে নির্মাণ কাজের সামগ্রী সেই মিস্ত্রী ছাড়াও

অর্জন করা সম্ভব। সেকিউলারিজম-এর ঘোষণা হচ্ছে, এই দুনিয়া ছাড়া 'আলো' আর কোথাও নেই। আর যদি থেকেও থাকে, তবুও তা মানবীয় লক্ষ্য অর্জনে সহকারী প্রমাণিত হতে পারে না। ধর্মীয় বিশ্বাস যতক্ষণ পর্যন্ত মানবীয় আনন্দ স্ফূর্তির সম্মুখে বাস্তব প্রতিবন্ধকতা দাঁড় না করাচ্ছে 'সেকিউলারিজম ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সে অবস্থায়ই থাকতে দেয়— মরে কিংবা বাঁচে, তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে 'সেকিউলারিজম্' সব সময়ই নাস্তিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। যদিও হলিউক সব সময়ই এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য রক্ষার ওপর জোর দিয়েছে। সে 'সেকিউলার' নীতিতে ব্রেডলাফ-এর সঙ্গে সানন্দে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। সেকিউলার উপায়-উপকরণের সাহায্যে যে লোকই মানবতার পারস্পরিক গঠন ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক হতো, তার প্রতিই সে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে প্রস্তুত ছিল। ইসলামে তওহীদী আকীদা ও নাস্তিকতা এই উভয়কেই সে মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাসবাদ মনে করত। ব্রেডলফ-এর মত ছিল এর বিপরীত। সে মনে করত, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস প্রতিহত করাই সেকিউলারিজম্-এর কর্তব্য। কেননা এই সব কুসংস্কারমূলক ধারণা-বিশ্বাস যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশিত হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বস্তুগত উন্নতি লাভ কল্পনাতীত হয়ে থাকবে। সেকিউলারিজম্-এর দাবি হচ্ছে, যুক্তি উপস্থাপনের নিয়মে বিবেক-বুদ্ধি ও অনুধাবন দিয়ে তার মৌলনীতিসমূহের প্রবর্তন ও পরিচ্ছন্নকরণের মাধ্যমে সেগুলিকে সমস্ত মানবতার ওপর অভিন্ন ভঙ্গিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সে বলেছে, নৈতিকতার ভিত্তি হচ্ছে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে, ইহাও সংকল্পে তার সম্ভাবনা নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

হলিউকের মতে বস্তুগত অবস্থা এমন করা সম্ভব যেখানে দারিদ্র্য ও বঞ্চনার শিকড় হবে উৎপাটিত। উপযোগবাদীদের (utilitarians) ন্যায় তারও বিশ্বাস ছিল, চরিত্রই হচ্ছে এমন একটি কার্যক্রম যা মানবতার সম্মিলিত কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম এবং মহাসত্য দিবালোকের মতোই উজ্জ্বল ও অনস্বীকার্য। তার মতে বিজ্ঞান যেমন করে মানুষের সুস্বাস্থ্যের মৌলনীতি নির্দেশ করতে পারে, অনুরূপভাবে মানুষের স্বচ্ছলতার নীতিও

উদ্ভাবন করতে সক্ষম। মানবীয় স্বচ্ছলতা অর্জনের জন্যে যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে পথ-নির্দেশ লাভ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনকালে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার অনুসরণ করা উচিত নয়। কেননা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ও ইচ্ছা প্রয়োগ করে আমরা না দৃঢ় প্রত্যয় অর্জন করতে পারি, আর না নিয়ম-শৃংখলা অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। কেবলমাত্র নিরপেক্ষ বিবেক-বুদ্ধিই পারে নির্ভুল প্রত্যয় ও নিয়মতন্ত্র সংরক্ষণ করতে। অতএব বিবেক-বুদ্ধিকে অবশ্যই অনাসক্ত ও স্বাধীন মুক্ত করে রাখা একান্তভাবে জরুরী। নীতি বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্ব পর্যায়ে চিন্তা-গবেষণা বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণার মতোই স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কোন প্রকারেরই গবেষণা, সমালোচনা ও প্রচারণা প্রকাশনার কারণে কোন আইনগত বা আত্মিক শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। জীবনের এই বাস্তব মতাদর্শ পেশ করে সেকিউলারিজম এমন একটা লক্ষ্য অর্জনের ব্রতী হয়, যা তার কথায় ধর্ম অর্ধাবস্থায় ছেড়ে দেয়। তা সত্যকেই সনদরূপে মানে, সনদকে মতরূপে গ্রহণ করে না। তা কর্তব্যবোধের কল্যাণকে কল্যাণের কর্তব্যবোধের ওপর অগ্রাধিকার দেয়।

It Topes Truth for Authority, not authority for truth, and substitutes. The piety for usefullness for the usefullness of piety.

মানবতার জন্যে যা-ই উত্তম ও কল্যাণকর, পরীক্ষা-নিরীক্ষার উত্তীর্ণ বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যেই তা নির্ধারণ করতে হবে এবং মানবতার স্রষ্টা নিশ্চয়ই তাকে স্বীকৃতি দিবে ও তা নিয়ে গৌরব প্রকাশ করবে। আধুনিক কর্তব্যবোধ স্বশক্তিতেই স্বীয় প্রকাশ ঘটাবে। আর 'সর্বজ্ঞানী' রকমারী আবেদন-নিবেদনে ক্ষুণ্ন হবে না। কার্যত আমরা সাধারণ রীতি-নীতির অধীন। সেই সাধারণ রীতি-নীতির অনুসন্ধান এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন করাই মানুষের কর্তব্য।

'সেকিউলারিজম-এর উৎকর্ষ ও বিকাশের পরিবেশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেকিউলারিজম্-এর প্রভাব চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হয়ে পড়ে। এই যুগটাই ছিল খ্রিস্ট ধর্মবিরোধী

প্রতিক্রিয়া 'সেকিউলারিজমে'র এবং তা তার সহযোগী চিন্তা মতের স্মারক আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল। উত্তকালে তা খুব দ্রুততার সঙ্গে বিলীয়মান হয়ে পড়ে এবং সুসংবদ্ধ বুদ্ধিবাদে লীন হয়ে স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে বুদ্ধিবাদই সেকিউলার প্রাণ-শক্তির নবতর রূপ উপস্থাপিত করছে। বলা আবশ্যক, সেকিউলারিজম্-এর সোনালী যুগ ছিল তখন যখন তা স্বীয় সহযোগীদের ধর্মবিরোধী প্রচারণার সঙ্গে সামগ্রিকভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। ব্রেডলফ-এর 'সেকিউলার' আন্দোলনে যোগদান এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অথচ হলিউক নাস্তিকতাকে 'সেকিউলারিজম'-এর অন্তর্ভুক্ত করাকে কখনই জরুরী মনে করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'সেকিউলারিজম'-এ নাস্তিকতা ক্রমশ শামিল হয়ে গেলে তখন প্রাচীন দ্বন্দ্ব নিঃশেষ হয়ে গেল। বিজ্ঞান ও ধর্মের বিচ্ছিন্নতার একটা ভারসাম্যপূর্ণ মতাদর্শ বিজয়ী হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এই সব জিনিসের সাহায্যে সেকিউলারিজম-এর আসল বিশেষত্ব নিঃশেষ হয়ে গেল। ফলে তাকে একটি সুসংগঠিত আন্দোলনরূপে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়ে দেখা দিল। তা স্বীয় মৌল ভাবধারা ও রীতিনীতিসহ নিজের পুনরুজ্জীবন সুসম্পন্ন করতে পারবে কি ? ..... এ ব্যাপারে অধুনা কঠিন সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

সেকিউলারিজম ভূমণ্ডলে মানবীয় জগত মানবীয় স্বার্থের সীমাবদ্ধতায় বিশ্বাসী। এ মতবাদ সম্ভব এবং কার্যত নিঃসন্দেহে সত্যভিত্তিক। কিন্তু মতাদর্শগত দৃষ্টিকোণে তাকে সত্য ভিত্তিক প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন সেকিউলারিজম্ এই কথা প্রমাণ করার জন্যই ব্যর্থ চেষ্টায় রত রয়েছে। বাস্তব দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে লক্ষ্য করা যাবে, অসংখ্য লোকের স্বার্থ ও সম্পর্ক সম্বন্ধ জীবনের বস্তুগত দিকসমূহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। দুনিয়ায় এই আচরণই কর্মোপযোগী। কেননা অধিকাংশ লোকই জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কোন সচেতন ও সক্রিয় মতাদর্শের ধারক নয়। কোন মতাদর্শের প্রয়োজনও হয় না তাদের। অন্য কথায়, মতাদর্শের অনুপস্থিতিতেই বাস্তব সেকিউলারিজম্-এর কর্মতৎপরতা নিহিত। সেকিউলারিজম কোন আদর্শ নয়। তা হচ্ছে আদর্শের অস্বীকৃতি (Negetion)। তা মানুষকে এইরূপ অপ্রয়োজনীয় ও অসম্পূর্ণ যুক্তি প্রমাণ দেখায়, যা না চেয়েও সে সেকিউলারিজম্-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করছে,

আর এটাই হচ্ছে 'সেকিউলারিজম্-এর দূর্বলতা। এটা সরল মনের স্বাভাবিক বাস্তববাদী মানুষকে দার্শনিক ভিত্তি সংগ্রহ করে দেয়ার চেষ্টা করার মতোই হাস্যকর ব্যাপার। অথচ এই সরলমনা মানুষ বাহ্যিক সত্যের অস্তিত্বের জন্যে তার সাক্ষ্যকেই অকাট্য প্রমাণরূপে গণ্য করে নেয়, এ ব্যাহ্যিক সত্য তেমনই, যেমন আমাদের সম্মুখে তা বর্তমান রয়েছে। বাস্তবতার দৃষ্টিতে তার জন্যে কোন দার্শনিক ভিত্তির আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। মতাদর্শের দৃষ্টিতে এ ভিত্তি সংগ্রহ করা কঠিন, কেননা দর্শন প্রাথমিক পদক্ষেপেই সরল মনের মানুষের প্রতিপাদ্য সমূহকে অশান্তনাদায়ক গণ্য করে। সেকিউলারিজম্ এর অবস্থাও ঠিক তা-ই। অসংখ্য লোক বাস্তবভাবে সেকিউলার। কিন্তু জীবন ও কর্ম পর্যায়ের সব মতাদর্শই বিবেচনা সাপেক্ষ। কিন্তু সেকিউলারিজ্ম্ তাকে কোনই গুরুত্ব দেয় না। হলিউক যদিও দাবি করেছিল যে, সেকিউলারিজম জীবন ও কর্মযোগের মতাদর্শ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আমি জানিনার মতোই নিরপেক্ষ। এ দুয়ের মধ্যে পরম মৈত্রী বন্ধন। তা এ দুটির একটাকে নিঃসন্দেহে অস্বীকার করে। তা যেহেতু কর্মকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে, এই কারণে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য লাভের কোন অবকাশই এখন তার নেই। বাস্তবতার দৃষ্টিতে যে কোন ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থকে 'সীমাবদ্ধতার মতাদর্শ' ছাড়াই সীমাবদ্ধ করতে পারে এবং 'নেতিবাচক মত' ব্যতিরেকেই পারে তাকে অস্বীকার (Negetion) করতে। এতদসত্ত্বেও আমরা যখন নিজেদের প্রতিই প্রশ্ন তুলি ঃ আমাদের নিজেদের জ্ঞানকে কেন সীমাবদ্ধ করে রাখতে হবে ? তখন তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের আচরণ অবলম্বন করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। আমরা এ দুটির কোন একটিকেও উপেক্ষা করতে পারিনে। পক্ষান্তরে ধর্ম এমন এক প্রকারের জ্ঞানের সন্ধান দেয়, যা বস্তুগত সম্পর্কের উর্ধ্বে অবস্থিত। এই ব্যাপারে ব্রেডলফ হলিউকের তুলনায় অনেক বেশি দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। ধর্মবিরোধী মতাদর্শের সঙ্গে সেকিউলারিজ্ম্কে জড়িত করা হলে তা খুবই জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই সত্য যখন প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন উক্ত সত্য অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ধর্মকে অস্বীকার করার পরিবর্তে তাকে উপেক্ষা করে বা এড়িয়ে চলতে চাওয়া অনেকটা অসম্ভব। কেননা ধর্ম বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয় পর্যায়ের সম্পর্ককে পারস্পরিক যুক্ত করে উপস্থাপিত করে। ধর্ম জীবনের বৈষয়িক দৃষ্টিকোণকে অস্বীকার করে। ধর্ম

গোটা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা ধর্মের বলিষ্ঠ দাবি। এই দাবি প্রতিরোধ বা খণ্ডন না করা পর্যন্ত সেকিউলার মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। কিন্তু কার্যত তা অসম্ভব। আল্লাহ তো আছেন, কিন্তু তিনি বাস্তবজগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না, এই প্রতিজ্ঞা (Theory) অ-গ্রহণযোগ্য ও অবাস্তব। যে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রাখে, সে সমস্ত মহাসত্যের তুলনায় এই সত্যকে এক উচ্চতর বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করে। তবে এটা অসম্ভব নয় যে, একজন তওহীদবাদী ব্যক্তি স্বীয় কার্যকলাপে আল্লাহ্‌র বিধানকে হয়ত বাস্তবভাবে অনুসরণ করে চলছে না বা সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আইন-কানুনকে কার্যকর করেনি। আর তা না করে সে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নিজের অ-দৃঢ়তারই পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু এই কর্মপদ্ধতিকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার জন্যে প্রয়োজনীয় শান্তনাদায়ক মতাদর্শ গড়ে তোলা খুবই কঠিন ও দুঃসাধ্য। এই কারণেই 'সেকিউলারিজম' যদি পূর্ণমাত্রায় ধর্মবিরোধী দৃষ্টিকোণ অবলম্বন না করে, তা হলে তার ব্যর্থতা অবধারিত হয়ে পড়বে। দার্শনিক দৃষ্টিকোণে— যেমন হলিউক পেশ করেছে সেকিউলারিজম-এর দুর্বলতা অনস্বীকার্য। তা এই সত্যে নিহিত যে, তা সত্য (Reality) মূল্যমান (Value)-এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ অক্ষম রয়ে গেছে। এই ব্যর্থতা ধর্মপরায়ণতারও রয়েছে, বলা চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা যখন স্বীয় দাবিসমূহকে বৈজ্ঞানিক রঙ মিশ্রিত করে পেশ করতে চেয়েছিল, তখন তা প্রকট হয়ে উঠেছিল।

সেকিউলারিজ্‌ম্ মতাদর্শের আহ্‌বায়কদের মতে মহাসত্য বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতা বর্হিভূত। বিজ্ঞানও এই কথা সমর্থন করে। মহাসত্য বিবেক-বুদ্ধি পর্যায়ের ব্যাপার বলা চলে। কিন্তু মূল্যমানের গুরুত্ব ও চিরন্তনতা কেবলমাত্র আকীদার কার্যকরতার দরুনই উদ্ভূত হয়। 'সেকিউলারিজম' গণিতশাস্ত্র ও রসায়নের ওপর অনুমান করে সত্যসমূহের নৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। তার সম্পর্ক কেবলমাত্র জ্ঞানের সঙ্গে, আকীদাহ বিশ্বাসের সঙ্গে নয়। এই ধরনের মৌলিক পার্থক্যের কারণে তা নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। তা সত্যের মানদণ্ডে তুলনামূলক মূল্যমানের পারস্পরিক ব্যাপারে ফয়সালা করে। সত্য (Truth) ও বিবেকবুদ্ধি (Reason) সম্পর্কে তার বক্তব্য আছে; কিন্তু এইসব পরিভাষা

নিহিত নিগূঢ় সত্যতার সঙ্গে কি সম্পর্ক রয়েছে, তা না বুঝেই মত প্রকাশ করে। মনে হয়েছে, এই সব পারিভাষিক শব্দ স্বতঃই মূল্যমানসমূহের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে বলে ধারণা করা হয়েছে। তুলনামূলক মূল্যমানের পারস্পরিক পার্থক্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। উপযোগবাদ একটা দার্শনিক মতাদর্শ। তা-ই সেকিউলারিজম-এর চালিকাশক্তি। এখন পর্যন্ত তা-ই ছিল বিজয়ী। সেকিউলার নৈতিকতা অনুযায়ী কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু উত্তরকালে তারও যখন পরাজয় সূচিত হলো, তখন তা-ই সেকিউলারিজম-এর ভিত্তি ছিল বলে— অনিবার্যভাবে সেকিউলারিজম্-এর দার্শনিক ভিত্তিসমূহও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এই সব কারণে তা জীবন ও কর্মের দর্শন হিসেবে অবশিষ্ট থাকতে পারেনি। তাই বলতে হয়, অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে তারও অনিবার্য অবসান সঙ্ঘটিত হয়। তার নৈতিক লক্ষ্য প্রশংসাযোগ্য হলেও তা কোন উপযুক্ত ভিত্তি থেকে বঞ্চিত। ফলে মানবীয় চিন্তার কোন শাশ্বত প্রকল্প দাঁড় করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঠিক এই কারণেই দর্শনের কোন গ্রন্থেই সেকিউলারিজম-এর উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। একটি সুস্পষ্ট শিরোনাম দিয়ে এই বিষয়ে কোন গ্রন্থেই আলোচনা করা হয়নি। কেননা তার মানব জীবনের জন্যে কখনই কোন আদর্শ বা Idiology হতে পারে না। সম্প্রতি ফেডারিক কম প্লেসটন দর্শনের ইতিহাস পর্যায়ে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তাতে সকল প্রকারের দার্শনিক মতাদর্শের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তাতে সেকিউলারিজম-এর কোনই উল্লেখ নেই।[১] বার্ট্রান্ড রাসেল রচিত 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস'[২] গ্রন্থেও এই বিষয়টি অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। 'দর্শনের বিশ্বকোষ' এ-ও এই বিষয়ের নাম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।[৩] আরও মজার কথা এই যে, বস্তুবাদের লীলাকেন্দ্র মস্কো 'দর্শনের অভিধান' প্রকাশ করেছে কিন্তু তাতেও এই বিষয়টি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

---

১. A History of philosopy— Froderick compleston, Serch press, London, 7th Impression— 1976.

২. History of western Philosophy— Bertrandrassell. unwinuniversity Books, 7th impression— 1974.

৩. The Encyclopedia of Philosopy— Paul Edward, Editorinchief the Macmillan company & the Free Press New Yark.

অ-ধর্মীয় ব্যবস্থা বা LAICISM

ফ্রান্সে সেকিউলারিজ্‌ম-এর পরিবর্তে LAICISM পরিভাষাটি সাধারণ্যে প্রচলিত হয়েছে। এটা সেই সময়ের কথা, যখন তৃতীয় রিপাবলিকের অধীনে প্রকৃত মূল্যমানের জন্যে গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই পরিভাষাটি গীর্জা ও রাষ্ট্রের সমস্যাদির সমাধানের দিকে অধিকতর লক্ষ্য আরোপ করেছিল।

'লেইসিজ্‌ম্' 'আধ্যাত্মিক শিকড়' 'রিনেসা' মানবতাবাদ— এবং সবচাইতে বেশী করে— 'আধুনিকতাবাদ' পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই যুগেই দুনিয়ার স্বাধীন ও প্রকৃতিগত মূল্যমান স্বীকৃত হতে শুরু করেছিল জীবনের সকল বিভাগে। রাষ্ট্র, সমাজ, আইন, অর্থ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও শিক্ষায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও কাল্পনিক সার্বভৌমত্ব কিংবা গীর্জায় সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। এ সময়ে ব্যক্তিকে নিজের ইচ্ছা মতো ধর্ম ও পেশা অবলম্বনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ অধিকার কেবলমাত্র ব্যক্তিগণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্মীয় সংগঠনসমূহে এই চিন্তাধারায় প্রচার তখন পর্যন্ত খুব একটা ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতে পারেনি। তবুও ধর্মীয় 'কমিউন'গুলিকে একান্তভাবে ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে এক স্বতন্ত্র সংগঠনের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল এবং জনগণের প্রতিনিধি বা গণ-জীবনের ওপর প্রভাবশালী হওয়ার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

ধর্ম থেকে নিষ্কৃতি লাভের কার্যক্রমকে যখন শাসনতান্ত্রিক আইন বানানো হলো, তখন তার তাৎক্ষণিক পরিণতিতে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হতে লাগল। ১৯০৪ সনে পোপের সঙ্গে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাপনার যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হলো। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় রিপাবলিক-এর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তার সম্পূর্ণতা বিধান করা হলো। ১৮০১ সনের পোপের সঙ্গে কৃত চুক্তি নাকচ করে দেয়া হলো। সাধারণ অর্থ ভাণ্ডার থেকে গীর্জাকে আর্থিক সাহায্য দান বন্ধ করে দেয়া হলো। গীর্জার সমস্ত দালানকোঠা সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হলো ও সরকারী মালিকানাধীন বলে ঘোষণা করা হলো। তবে উপাসনা শিক্ষা দানের জন্যে নিয়োজিত

সরকারী ও সনদধারী জনগোষ্ঠীকে এবং তাদের বাইরের সংগঠনসমূহকে এইসব দালানকোঠা বিনামূল্যে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এসব সরকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাও সরকার কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। তৃতীয় রিপাবলিকের শিক্ষা ব্যবস্থা এক ধরনের সরকারী ধর্ম ছিল। যাকে বলা হতো 'রাষ্ট্রীয় নাস্তিকতা'। ১৭৯৩— ১৭৯৫ এর বিপ্লবের 'খোদা ও মানুষের প্রেম' (Theophilanthropism)-কে ধর্মের 'উত্তম বিকল্প' মনে করে নেয়া হলো। ১৮৮২ সনে যখন সরকার চালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ধর্মীয় পাঠ্য প্রত্যাহার করা হলো ঠিক তখনই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। তখন ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে সরকারীভাবে বিরচিত নৈতিক শিক্ষা প্রচলিত করা হলো। প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহ বিশ্বাসকে নৈতিক শিক্ষার প্রাথমিক উৎস রূপে অবশিষ্ট রাখা হয়েছিল বটে, কিন্তু ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত Liguedelienseignement সমস্ত আল্লাহ্‌র বিধান থেকে নৈতিকতাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে রাখার দাবি জানালো। এভাবে রাষ্ট্রীয় গির্জাও ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের পতাকা উন্নত করে ধরল। ক্রমশ এই মতাদর্শ সার্বজনীন খ্যাতি অর্জন করে বসল। স্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পক্ষে ধর্মীয় আইন-কানুন ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। এই কারণে আইন প্রণয়নকে তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ঘুরিয়ে দেয়া হলো। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় চিন্তা-পদ্ধতিকে বেআইনী ঘোষণা করা হলো। অন্যান্য গীর্জার জনগোষ্ঠীকে সরকারী সনদ লাভের জন্যে সরকারের নিকট দরখাস্ত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। ১৯০১ সনের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ধর্মীয় স্থান গ্রহণ ও তথায় নতুন ইমারত নির্মাণের জন্যে সরকারের নিকট থেকে লাইসেন্স পাওয়াকে জরুরী করে দেয়া হলো। ১৯০৪ সনে নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মীয় স্থানগুলিতে সকল প্রকারের ধর্মীয় প্রচারমূলক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। এই বিশেষ সমস্যা ফ্রান্সের ন্যায় ইউরোপের অন্যান্য অংশেও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ 'সেকিউলার' রাষ্ট্রের অধীন রাখা হবে, না গীর্জার কর্তব্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হবে ? রাষ্ট্র যখন ধর্মের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে কঠোর নীতি অবলম্বন করল, তখন ক্যাথলিক পন্থীদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরক্ষামূলক চেষ্টা-প্রচেষ্টা শুরু করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের credo-কে শোনা ও দেখা ছাড়া তারা আর কিছুই

করতে সক্ষম হলো না। রিপাবলিকান রাষ্ট্র এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্যে অনুমতিপ্রাপ্ত নয়, একথা তারা বুঝতে পেরেছিল। ফরাসী ক্যাথলিক পন্থীদের অধিকাংশই নিজেদের প্রাধান্য বহাল রাখার কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর করে বেঁচেছিল। কেননা ক্যাথলিক গীর্জার বাহ্যিক অবস্থিতির এটাই ছিল একমাত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ক্যাথলিকদের এই পদক্ষেপ ছিল একান্তভাবে আত্মরক্ষামূলক। এর দরুন রাষ্ট্র অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির হয়ে গেল। ফরাসী ক্যাথলিকদের অধিকাংশ লোক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সর্বাত্মক বিপর্যয়ের পর বিস্মৃত গহ্বর থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা তাদের ধর্মীয় প্রাধান্য পুনরায় অর্জন করার জন্যে চেষ্টানুবর্তী হয়ে উঠল। পোপের ঘোষণাবলী যদিও ছিল আত্মরক্ষামূলক, তবুও তারা নিজেদের আচরণে ভারসাম্য রক্ষার নীতি অবলম্বন করতে শুরু করেছিল। কার্ডিনাল লাভী-জীবী সমঝোতামূলক সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পাইস দশম (Pius—x) গীর্জার যুক্তিসম্মত ও বৈধ কর্মনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাওয়ার তীব্র নিন্দা করতে শুরু করল স্বীয় বক্তৃতা ও ভাষণসমূহে। গীর্জা ও রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতাকেও সে প্রত্যাখ্যান করে দিল। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে পাইস-একাদশ (PIUS—XI) তার পুস্তিকায় LAICISM কে গীর্জার নিজস্ব শব্দ সম্ভারের অর্ন্তভুক্ত করে নিল। গীর্জার বৈরাগ্যবাদী সতর্কতা অবশিষ্ট থাকল এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে নবতর সম্পর্কের কারণে তা আরও পরিপক্কতা লাভ করল। ওদিকে রাষ্ট্র গীর্জা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সংক্রান্ত আইনসমূহ খুবই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে কার্যকর করছিল। গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যকার ব্যবধান একটি চুক্তির সাহায্যে দূর করে দেয়া হলো। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে HOLYSEE-র ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সম্পর্ক পুনর্বহাল করা হলো। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রধান পাদ্রী সংক্রান্ত ফরাসী ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর গীর্জা চিন্তার আদান-প্রদানের দ্বার উন্মুক্ত রাখার নীতি গ্রহণ করল। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে LAICISM-এর তাৎপর্য প্রকাশ করা হলো এই ভাষায় ঃ রাষ্ট্র ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেই আইনগত অধিকার ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা— যা রাষ্ট্র ও জনগণের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে ব্যবহার ও প্রয়োগ করবে, তার ভিত্তিতে বেসরকারী আইনের অধীন ধর্মীয় সংগঠনসমূহের অস্তিত্ব এবং নাগরিকদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিরাপত্তা দেয়া হবে। শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রতিষ্টানসমূহ পর্যায়ে CAMBRAI-এর আর্চ বিশপ

ই. এম. গৌরী (E.M.GMERRY)-র উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে ঃ 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন সাম্প্রদায়িকতার অধীন হবে না। সেগুলির বিশেষ কোন নামও রাখা হবে না। বরং সেগুলি হবে নিরপেক্ষ। না ধর্মের পক্ষে কোন কথা বলবে, না তা ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে।'

আর্চ বিশপের মতে এটা Laicism-এর বিপরীত দিকে পদক্ষেপ। কেননা এটা একটি দার্শনিক মতাদর্শ। এর ভিত্তি উপযোগবাদ, বস্তুবাদ ও দার্শনিক নাস্তিকতার ওপর রক্ষিত। এরই বলে রাষ্ট্র সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর তা কার্যকর করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তার অন্তর্ভুক্ত। (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ) গীর্জার এই আচরণ ভ্যাটিক্যান-২-এর সে সব ঘোষণা থেকে সমর্থন লাভ করল, যাতে বৈষয়িক সত্যসমূহের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। তারই ফলে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের পছন্দসই রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেল। অন্যকথায় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উভয় প্রান্তের বাইরে থেকে গীর্জা নিজের প্রাধান্যকে বাঁচিয়ে রাখার দাবি জানাচ্ছিল। অথচ একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেই দেখা যায়, গীর্জাই বাস্তবভাবে রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছিন্নতাকে পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করে নিয়েছিল। আর সরকারেরও একমাত্র কাম্য ছিল তা-ই।

সেকিউলারিজম-এর এই দীর্ঘ বিস্তারিত ইতিহাস অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, তা একটি বিশেষ ইউরোপীয় পরিস্থিতির উৎপাদন। খ্রিস্ট রাষ্ট্র যেমন সেকিউলার, খ্রিস্ট ধর্মও অনুরূপভাবেই সেকিউলার। সেকিউলারিজম-এর সঙ্গে মুসলিম সমাজ তথা দ্বীন-ইসলামের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই। তার সঙ্গে সামান্য মাত্র সামঞ্জস্য-ও নেই। তাই ইসলামে সেকিউলারিজম্ সমর্থিত নয়। যেমন নয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। কোন মুসলমানের পক্ষেই সেকিউলারিজম-এর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সম্ভব নয় সেকিউলারিজম-এর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে দ্বীন-ইসলামের প্রতি একবিন্দু ঈমানদার হওয়া বা থাকা।

কিন্তু এই সেকিউলারিজম-ই আমাদের দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত ও কলুষিত করে ফেলেছে। সেকিউলার রাজনীতি মুসলমানদের সার্বিকভাবে দ্বীন-ইসলামের বাইরে নিয়ে গেছে এবং পূর্ণাঙ্গ দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে তা-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বপেক্ষা বড় বাধা। আর

অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের বাধ্য করেছে সুদ-ঘুষ-দুর্নীতি-শোষণ-প্রভৃতি সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী কার্যক্রমের ধারক ও বাহক হতে। মুসলিম জীবনকে সার্বিকভাবে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করে দেয়ার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে ইউরোপীয় খ্রিস্টান সমাজ থেকে আগত এই সেকিউলারিজম। সেকিউলারিজম ইসলামী জীবনধারার প্রধান প্রতিবন্ধক। যে কোন দিকে সেকিউলারিজমকে গ্রহণ করা হলে ইসলামী জীবন সম্ভব নয়। তাই ইসলামী জীবনাদর্শ গ্রহণ ও পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠার জন্যে সেকিউলারিজমকে জীবন সমাজ রাষ্ট্র ও অর্থনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা একান্তই অপরিহার্য।

ডারউইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব

আধুনিক যুগে ক্রমবিকাশবাদ (Evolution Theory) একটি বৈজ্ঞানিক মহাসত্যরূপে বিদ্যজ্জনের সমাজে স্বীকৃত। Science of life গ্রন্থের প্রণেতাগণ লিখেছেন ঃ আঙ্গিক ক্রমবিকাশকে একটি মহাসত্যরূপে মেনে নিতে এখন কারুরই আপত্তি থাকতে পারে না। কেবল সে সব লোক ছাড়া, যারা মূর্খ বা বিদ্বেষী, কিংবা কুসংস্কারে নিমজ্জিত। Modern packet Library— New York 'Man and the Universe' নামে বইয়ের একটা সিরিজ প্রকাশ করেছে। এই পর্যায়ের পঞ্চম গ্রন্থটিতে ডারউইনের Origin of Speices বই খানিকে ইতিহাস স্রষ্টা বলে আখ্যায়িত করে বলা হয়েছেঃ

> মানুষ স্বীয় বংশ তালিকা জানবার জন্যে দীর্ঘকাল ধরে যে চেষ্টা চালিয়ে আসছে, এই পর্যায়ে কোন মতবাদকে এতটা তীব্র ধর্মীয় বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি, যতটা হতে হয়েছে ডারউইনের লিখিত Natural Selection গ্রন্থটিকে এবং অপর কোন মতবাদ এতটা বৈজ্ঞানিক সমর্থন (Scientific affirmation) পায়নি, যতটা এই মতবাদটি পেয়েছে। (Philosophers of Science— p-244)

আমেরিকার প্রখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী বিজ্ঞানী G. G. Simpson লিখেছেন ঃ

> ডারউইন ছিলেন ইতিহাসের উচ্চতর লোকদের অন্যতম। তিনি মানবীয় জ্ঞানের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এই উচ্চতর মর্যাদা তিনি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন এই কারণে যে, তিনি 'ক্রমবিকাশ' মতবাদ (Theory of Evolution)-কে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গভাবে একটি মহাসত্যরূপে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, একটা নিছক অনুমান বা বিকল্প প্রকল্পরূপে নয়, যা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের জন্যে তৈরী করা হয়েছিল। [Meaning of Evolution (H.Xi 951) P-127]

এ. ঈ. মেণ্ডর লিখেছেন ঃ

> মানুষ ও অন্যান্য প্রাণসম্পন্ন জিনিসসমূহের বর্তমান আকার-আকৃতি পর্যন্ত পৌছতে ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়েছে এই মতটি এত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মতটিকে এক্ষণে প্রায় নিশ্চিত ও বাস্তব (approximate certainity) বলা যেতে পারে।

লাল (R. S. Lull) লিখেছেন ঃ

> ডারউইনের পর ক্রমবিকাশ মতবাদটি অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এমনকি চিন্তাশীল গবেষকদের নিকট এ ব্যাপারে কোনই সংশয় নেই যে, এটাই একক যৌক্তিক পদ্ধতি, যার ভিত্তিতে সৃষ্টি কর্মের ব্যাখ্যা দেয়া এবং তা অনুধাবন করা সম্ভব (Organic Evolution— p-15)

তিনি আরও লিখেছেন ঃ

> সমগ্র বিজ্ঞানী ও অন্যান্য অভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকই ক্রমবিকাশ মতের সত্যতায় (Truthness) সম্পূর্ণ নিশ্চিত, তা প্রস্তর পর্যায়ের হোক কিংবা জীবজন্তু পর্যায়ের। অন্য কথায়, পৃথিবী যখন জীবনের বাসোপযোগী হলো তখন দীর্ঘকালীন কার্যক্রমের ফলে প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু জীবনের উন্মেষ হলো। অতঃপর দীর্ঘতম কালের ক্রমাগত কার্যক্রমের ফলে উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর সেইসব বিস্ময়কর প্রজাতিসমূহ অস্তিত্ব লাভ করল যা আজ আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছি। (ঐ— পৃ. ৮৩)

এই মতবাদটির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে এটা দেখেও অনুমান করা চলে যে, লাল-এর সাত'শ পৃষ্ঠার গ্রন্থে জীবনের সৃষ্টিমূলক ধারণা (Special Creation) পর্যায়ের আলোচনা শুধু একপৃষ্ঠা ও কয়েকটি ছত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। 'ইনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিক'— ১৯৫৮ গ্রন্থে সৃষ্টি সংক্রান্ত (Creationism) মতবাদের আলোচনার জন্যে মাত্র এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠারও কম স্থান বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু তার বিপরীত 'আংগিক অভিব্যক্তি (Organic Evolution) শীর্ষক যে রচনাটি সন্নিবেশিত হয়েছে, তা ক্ষুদ্র টাইপে পূর্ণ চৌদ্দটি পৃষ্ঠায় বিস্তৃত হয়ে আছে। এই প্রবন্ধটিতেও জীব-জন্তুর ক্রমবিকাশকে একটি চূড়ান্ত সত্য ঘটনা (Fact) হিসেবে সমর্থন করা হয়েছে

এবং বলা হয়েছে যে, ডারউইনের পর এই মতবাদটি বিজ্ঞানী ও জনগণ কর্তৃক সাধারণভাবে স্বীকৃত (General acceptance) হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, বিজ্ঞানীরা আংশিক আংশিক ক্রমবিকাশ মতবাদটিকে সাধারণ সত্যরূপে নিরূপণ করলেন কিভাবে ? তাঁরা কি অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জীবজন্তু ও মানুষকে আংশিকভাবে ক্রম বিবর্তন লাভ করতে দেখতে পেয়েছেন ? বিজ্ঞান পারদর্শীরা কি এমন কোন অকাট্য দলিল পেয়েছেন, যদ্দারা সমগ্র জীবজন্তু ও মানুষ এক সহজ সরল পর্যায়ের প্রাথমিক জীব থেকে আংগিক বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমবিকাশ লাভের পদ্ধতিতে অস্তিত্ব লাভ করেছে বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ?

এই প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞানবিদেরা বলেছেন, তাদের নিকট নাকি এরূপ দলীল রয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণের অকাট্য পদ্ধতিতে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আংগিক ক্রমবিকাশ লাভের এই মতটি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সর্বতোভাবে সত্য।

বিজ্ঞানীদের এই জবাব বিশেষভাবে একটি ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল আর তা হচ্ছে, জীবজন্তু প্রাণী অস্বাভাবিকভাবে দৈহিক ও আংগিক সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও উচ্চতর ও নিম্নতর বহু প্রকারে (Kind) বিভক্ত। এগুলোর পারস্পরিক সাদৃশ্য প্রমাণ করে যে, এগুলো সব একই বংশজাত, আর সেগুলোর উচ্চতর ও নিম্নতর প্রকারভেদ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এগুলো ক্রমবিকাশ পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রজাতিতে পরিণতি লাভ করেছে।

জীব ও প্রাণীকুলের মধ্যে সর্বপ্রথম যে সব প্রাণী আসে, তারা 'এ্যামীবা' (amoeba) নামে পরিচিত। এগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়। এগুলোর গোটা দেহ এককোষ সম্পন্ন মাত্র। খাদ্যগ্রহণ, খাদ্য হজমকরণ, হজম হয়ে যাওয়া খাদ্যের দেহাংশে পরিণত হওয়া এবং আবর্জনা নিষ্কাশন, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ এবং প্রজনন ও বংশ সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা প্রভৃতি জীবনের অপরিহার্য কার্যাবলী এই এককোষ সম্পন্ন দেহ দিয়েই সুসম্পন্ন করে থাকে। অতঃপর যা লক্ষ্য করা যায়, তা হাইড্রা (Hydra) নামে খ্যাত। এর রয়েছে কয়েক সহস্র কোষ। পোকার (worm)-ও থাকে কয়েক লক্ষ কোষ। আর একটি

মানব দেহ কয়েক হাজার কোটি কোষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। অপরাপর জীব-জন্তু অপেক্ষা মানবদেহের কোষের প্রকারও হয়ে থাকে অনেক বেশি। এ থেকে জানা গেল যে, বিভিন্ন জীব ও প্রাণী স্বীয় দৈহিকতা ও জটিলতায় পরস্পর থেকে যথেষ্ট মাত্রায় বিভিন্ন।

যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার দিক দিয়েও এ গুলোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। 'এ্যামীবা' ও 'হাইড্রা' প্লাবন, স্রোত ও শুষ্কতার দয়ার ওপর নির্ভরশীল। একটা পোকা মাটির খুব ক্ষুদ্র স্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত। মাছের পরিধি অধিক বিস্তীর্ণ। প্রতিকূল অবস্থায় স্বীয় অবস্থিতির পরিবর্তন তার স্যধ্যায়ত্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাছ পানিতেই থাকে। পানির অভ্যন্তর ছাড়া মাছের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। কুকুর পানিতে সাঁতার কাটে; আর স্থলভাগে দৌড়ায়। কিন্তু মানুষ জল ও স্থলভাগ ছাড়াও শূন্য লোকের উপরও কর্তৃত্ব করে।

পরিবেশের যে অবস্থা এই সবের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তাও বিস্ময়করভাবে বিভিন্ন। এ্যামীবা'র প্রভাবিত হওয়ার ঘটনাবলী এক মিটারের কয়েক হাজার ভাগের একভাগের মধ্যে সঙ্ঘটিত হয়, যখন আলো ও কম্পন তাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু এই আলো ও কম্পনের উৎস কোথায় এবং তার দূরত্ব কতটা, তা জানবার কোন উপায় তার আয়ত্তে নেই। তা খুবই সাদাসিধাভাবে আলো ও কম্পনের প্রভাব গ্রহণ করে থাকে। হাইড্রা— সাপের মতো এক প্রকারের সামুদ্রিক পোকা— কয়েক শত মিটার দূরত্বের পরিবেশ থেকে প্রভাব গ্রহণ করে। পোকা আকারে কিছুটা বড় হয়। তা কোন অতিরিক্ত অনুভূতিশীল অংগ ব্যতিরেকেই আলো ও অন্ধকার অনুভব করতে পারে। কিন্তু তা কোন জিনিসের সংগঠন, তার বর্ণ বা দূরত্ব দেখতে পারে না। সে জানতে পারে কেবল তখন, যখন পৃথিবীতে কম্পন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তা শুনতে পায় না। কেননা বিভিন্ন ধ্বনি ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য করার কোন সাধ্য তার নেই। মানুষের ন্যায় পরিবেশকে আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কোন চেষ্টা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা পরিবেশের সঙ্গে তার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। তা বাইরের সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক হয়ে একটা বদ্ধ জগতে জীবন যাপন করে। আমাদের অনুভূতি-যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও তা প্রায় দুর্বোধ্য। মাছ প্রতিবিম্ব দেখতে পারে

কিন্তু পানির বাইরের কোন জিনিস দেখা তার পক্ষে কঠিন। পানির মধ্যেই তার সবকিছু প্রায় সীমাবদ্ধ। কয়েক ফুটের একটি গর্তই তার জগত। কুকুর দেখে ও শুনে, আঘ্রাণের শক্তিও তীব্র। পৃথিবীর বুকে দৌড়ানোও তার পক্ষে সম্ভব। ইন্দ্রিয় নিচয় দ্বারা তার অনুভবকৃত পরিবেশ মানুষের পরিবেশের মতোই বিস্তীর্ণ কিন্তু পরিবেশকে অনুধাবন করা মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব তার পক্ষে ততটা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য বা তারকা-নক্ষত্র সমূহের মধ্যকার দূরত্ব অনুধাবন করা কুকুরের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়, যা মানুষের পক্ষে সহজ। অনুরূপভাবে কুকুরের মন ইন্দ্রিয়ানুভূত জিনিসসমূহের মধ্যে বুদ্ধিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম নয়, যা মানুষ পারে। কুকুরও জানতে পারে; কিন্তু সে জানাটা অ-বুদ্ধি বিবেকসঞ্জাত।

সাপ তার ডিমসমূহ মাটির উপর ছেড়ে দেয়। তা থেকে আপনা আপনি বাচ্চা বের হয়ে আসে। পাখি ডিম পেড়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত 'তা' দিতে থাকে। এই সময়ে পুরুষ পাখি তার অন্ন জোগায়। অনেক সময় পুরুষ পাখি ও স্ত্রী পাখি উভয়ই পর পর ডিমে 'তা' দেয়। দুগ্ধ দানকারী জন্তুগুলোর অবস্থা এদের থেকে উন্নত ও অগ্রসর। স্ত্রী পশু বাচ্চা প্রসব করে স্বীয় দেহের 'রক্ত' সৃষ্ট দুগ্ধ পান করিয়ে করিয়ে বাচ্চাকে পালে ও বড় করে।

এভাবেই বিভিন্ন জীব ও জন্তুর মধ্যে স্তর ভেদ বিদ্যমান। স্তর ভেদের এইরূপ অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এগুলোর মধ্যে একটা বিকাশমান বিন্যাস পরম্পরা রয়েছে। নিম্নতম পর্যায়ের জীব জৈবিক ক্রমবিকাশের অতীত স্তরসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর উচ্চতর বা উন্নততর জীব জৈবিক ক্রমবিকাশের পরবর্তী স্তরসমূহ তুলে ধরে। বিজ্ঞানীদের মতে এ নিছক অনুমান বা কল্পনা নয়। এ হচ্ছে জীবনের সেই অকথিত কাহিনী, যা মাটির স্তরসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর তা এই মতবাদটিকে পর্যবেক্ষনিক যুক্তি পর্যায়ে সর্বতোভাবে সঠিক ও নির্ভুল প্রমাণ করে।

ভারতের শিমলা ও চন্ডীগড়ের মাঝখানে সিওয়ালিক (Siwalik) নামে পরিচিত একটি পর্বতমালা অবস্থিত। এখানকার ভূপৃষ্টের উপর নানাস্থানে দাঁত, মাথার খুলি ও অস্থিখন্ড প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখা যায়। কেবল এখানেই নয়, দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে এ রকম পাওয়া গেছে। আসলে এগুলো কোটি কোটি বছর পূর্বে দুনিয়ায় বসবাসকারী

জন্তু-জানোয়ারের দেহ কাঠামোর ধ্বংসাবশিষ্ট মাত্র। তা মাটির তলায় পড়ে গেছে এবং দীর্ঘদিনের কার্যক্রমের ফলে তা প্রস্তরে রূপান্তরিত হয়েছে। উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর এই প্রস্তরায়িত রূপকে ফসিল (Fossile) বলা হয়। ভূমিকম্প ইত্যাদির ফলে এগুলো মাটির তলদেশ থেকে উপরে উঠে এসেছে। অথবা মাটি খোদাই কাজের দরুনও এগুলো আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে। বর্তমানে এই ফসিল বিপুল পরিমাণে পাওয়া গেছে এবং বড় বড় যাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্যে সংরক্ষিত হয়েছে। এই প্রস্তরায়িত দেহাবয়বের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো কোথায়ও পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় খণ্ড খণ্ড টুকরা টুকরা রূপে। অবশ্য বিশেষজ্ঞগণ এই খণ্ড টুকরাসমূহ একত্রিত সংযোজিত করে প্রাচীন জীব-জন্তুর আকৃতি বানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন।

এইসব প্রস্তর খণ্ড ভূ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মিলিত ও পরস্পর সংযোজিত করার ফলে এক মহাসত্যের উদ্ঘাটন সম্ভবপর হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে যে কোন প্রস্তর খণ্ডকে দেখে তার বয়স এবং কতকাল ধরে তা পৃথিবী পৃষ্টে অবস্থান করছে তা অতি সহজেই বলে দেয়া যেতে পারে। প্রস্তরসমূহের স্তর দেখে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের বয়স জানতে পারা আজকের দিনে কঠিন কিছু নয়। এই বিজ্ঞানের আলোকে প্রস্তরায়িত খণ্ড সমূহকে দেখে জানা গেছে যে, সকল প্রকার জীব-জন্তুই প্রথম দিন থেকেই আর পৃথিবীতে অবস্থান করছে না। এগুলোর মধ্যে কালের একটি স্তর বিন্যাস রয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম স্তরগুলো হালকা ও প্রাথমিক পর্যায়ের জীবগুলোর সন্ধান দেয়। অতঃপর পাওয়া যায় পর্যায়ক্রমিক জটিল ও উন্নত মানের জীবের সন্ধান। আর সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত এই মানুষ। এই উদ্ভাবনের ভিত্তিতে বিবর্তন তত্ত্বের সমর্থনে অসংখ্য গ্রন্থাবলী রচিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, অতঃপর ক্রমবিকাশবাদ একটা পর্যবেক্ষণিত পর্যায়ে প্রমাণিত তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। প্রখ্যাত প্রাণীবিদ জুলিয়াস হাক্সলি ও জে. বি. এম হল্ডেস-এর যৌথভাবে লিখিত Animal Biology গ্রন্থে লিখেছেন।

> প্রাণী প্রজাতিসমূহের সাধারণ ও উচ্চ বিন্যাস থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, উচ্চতর জীবসমূহ বিবর্তিত হয়ে পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এইগুলোকে আমরা যেন ঠিক অস্তিত্ব লাভ করতে দেখতে পাচ্ছি, যখন

আমরা পিছনের দিকে ফিরে ফসিলের সাহায্যে ইতিহাস অধ্যয়ন করি। এটা অনুমান বা ধারণা পর্যায়ের হলেও দৃঢ় প্রত্যয়ের সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে আছে। পৃথিবীর যে প্রাথমিক ইতিহাস প্রস্তর খণ্ড ও প্রস্তরায়িত কাঠামোসমূহে অংকিত হয়ে আছে, তা এখন পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় লিপিবন্ধ হয়নি। তা সত্ত্বেও এ এক প্রমাণিত সত্য যে, জীবন সাধারণ ও নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীকুলের রূপে উন্মেষ লাভ করেছিল।' (Modern scientific thought— p 293)

এই ঘটনার সঙ্গে জৈব-জীবনের অপরাপর ঘটনাবলী মিলিয়ে নিলে অনুমান পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। আর তা হচ্ছে, জীবগুলো পারস্পরিক বহু বৈষম্য ও পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অসাধারণভাবে পরস্পর সাদৃশ্য সম্পন্ন। মানবীয় কাঠামোর এক একটি 'অস্থির' সঙ্গে ঘোড়া, বানর বা চামচিকার 'অস্থি'র তুলনা করা চলে। জীব-জন্তুসমূহের দৈহিক গঠন এবং এগুলোর হাড়, রগ ও স্নায়ুগুলো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হলে স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, সব জীবই পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। আর এইগুলো গোড়ায় ছিল একটি জীব। সহস্র কোটি বছরের বিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিণতিতে এইগুলো বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণ প্রাথমিক পর্যায়ে পরস্পর সদৃশ। আমাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তি সত্তাই এককোষ নিয়ে জীবনের সূচনা করেছে। অন্যান্য দুগ্ধপায়ী জীবকুলের প্রাথমিক কোষের তুলনায় শুধু পরিমাণ ও গঠন প্রকৃতির কতিপয় সূক্ষ্ম দিকে (Fine details) বিভিন্ন হয়ে থাকে। এই কোষ একটি থেকে দুটি ও দুটি থেকে চারটিতে পরিণত হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। জন্মের পূর্বে মানব শিশু মাছ, ব্যাঙ, সাপ ও প্রাথমিক পর্যায়ে দুগ্ধদায়ী প্রাণীকুল এবং বন মানুষ সদৃশ আকৃতি অবলম্বন করে। এক পর্যায়ে তার পাখা গজায় এবং পরবর্তী এক পর্যায়ে তার লেজ বের হয়। জন্মের তিন মাস পূর্বে তার সমগ্র দেহে কালো মসৃণ পশমে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। ক্রম বৃদ্ধির পর্যায়ে বানর ও মানব শিশু পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ থাকে। কেবল মাত্র শেষ পর্যায়ে এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য করা সম্ভবপর হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও মানব শিশু ঠিক তেমনি লালন-পালন পায়, জীব-বিজ্ঞানীদের মতে ঠিক যেভাবে মানব বংশের ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছিল। তা যখনই স্বীয় হাত-পা ব্যবহার করার যোগ্য

হয়ে যায়, তখনই হাটুর উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শুরু করে। অর্থাৎ ঠিক চতুস্পদ জন্তুর মতোই শুরু হয় তাঁর জৈবজীবন। কেবল এই একটি ক্ষেত্রেই নয়, অসংখ্য প্রকারের সাদৃশ্য রয়েছে জীবগুলোর পরস্পরের মধ্যে। এর ভিত্তিতে জীব-বিজ্ঞানীরা এই মতবাদ রচনা করেছে যে, প্রত্যেকটি প্রাণীই তার জীবনের সামান্য সময়ের মধ্যে সেই সমস্ত পরিবর্তন গুলোরই পুনরাবৃত্তি করে, যা এর পূর্বে তার পূর্ববংশের লক্ষ্য কোটি বছরের পরিসরে সঙ্ঘটিত হয়েছে। মানুষ ও জীবের ভ্রূণ ও তার ক্রমবৃদ্ধির ক্ষেত্রের সাদৃশ্যের উল্লেখ করার পর বিজ্ঞানী লাল লিখেছেন ঃ

> গর্ভের অন্ধ প্রকোষ্ঠে উপরোক্তভাবে যে বিস্ময়কর পরিবর্তনসমূহ সঙ্ঘটিত হয়, তা খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সেই সমস্ত পরিবর্তনেরই পুনরাবৃত্তি যা পৃথিবীর উপরিভাগে দীর্ঘকাল ধরে ইতিপূর্বে সঙ্ঘটিত হয়েছে। (Organic Evolution— p. 666)

অন্যান্য জীব-জন্তু অপেক্ষা মানুষ ও বনমানুষের মধ্যকার সাদৃশ্য আধিকতর ঘনিষ্ঠ। এই কারণে মনে করা হয়েছে যে, মানুষ সম্ভবত বনমানুষেরই পরবর্তী ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত বংশ। এই দুই শ্রেণীর জীবের আকৃতির মধ্যে বর্তমান সাদৃশ্য সমূহ স্যার আর্থার কিইথের (Keith) গণনানুযায়ী এটি ধরা পড়েছে, যা অপরাপর লেজুড় সম্পন্ন বানরের মধ্যে পাওয়া যায় না। ডারউইন তার গ্রন্থে মানুষের বংশধারার প্রথম অধ্যায়ে মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর মধ্যে বহু সংখ্যক সাদৃশ্যের উল্লেখ করে শেষে লিখেছেন ঃ

> আমাদের বিদ্বেষ ও অহংকারই আমাদের পিতৃ পুরুষদের মুখে একথা বলিয়েছে যে, তারা দেবতার সন্তান। আর এই অনুভূতিই মানুষকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে দেয়নি যে, (তারা স্বতন্ত্র কোন সৃষ্টি নয়, আসলে তারা অন্যান্য জীব-জন্তুর ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত বংশধর মাত্র)। কিন্তু সে সময় অবশ্যই আসবে, যখন বিস্মকরভাবে তারা জানবে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা এটা ভালভাবেই জানতেন যে, মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীব-জন্তুর দেহ কাঠামোতে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তাদের দৃঢ় প্রত্যায় ছিল যে, তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে সৃষ্টি করা হয়নি।'
>
> [Descent of man (London-1946) p-26]

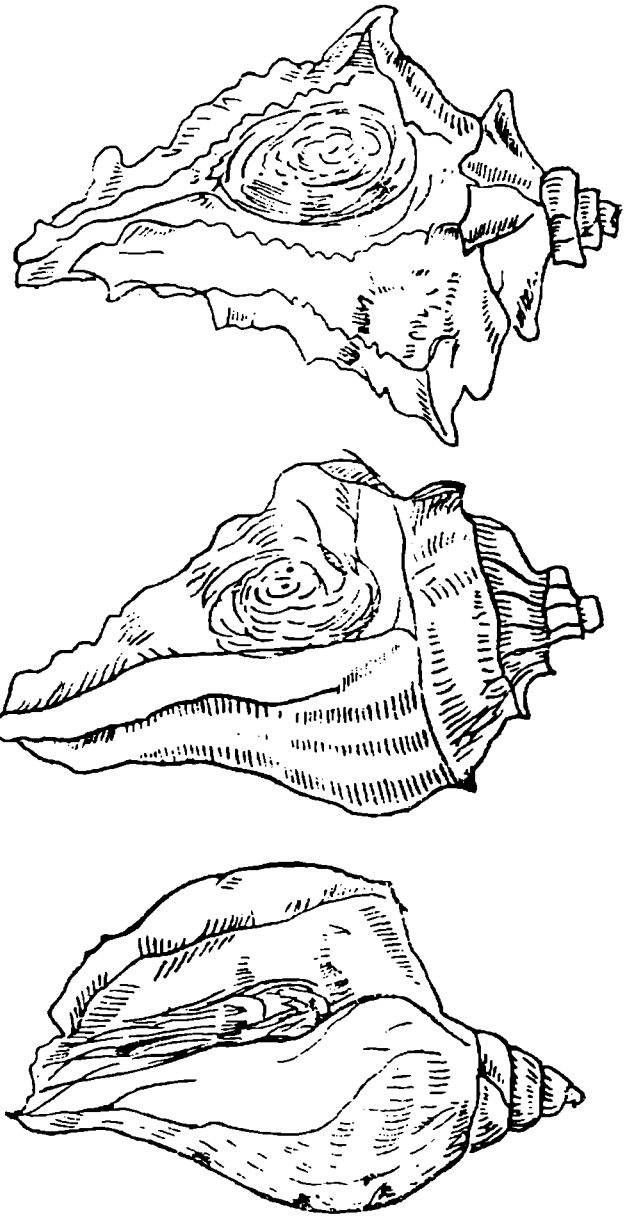

মিষ্ট পানিতে সতের প্রকারের শামুক পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে পর্যায় বিন্যাস পরম্পরা নির্ধারণ করে প্রাণীবিদ্‌রা দাবি করেছেন যে, এগুলো আসলে একই শামুকের আগের পরের অভিব্যক্তি পর্যায় সমূহ মাত্র। এখানে তিনটি শামুকের ছবি দেয়া হয়েছে। অভিব্যক্তিবাদী বিজ্ঞানীদের দাবি অনুযায়ী তাদের মতবাদের দুটি ভিত্তি এগুলোর মধ্যে প্রকট্‌ভাবে বর্তমান— তার একটি হচ্ছে এগুলোর পারস্পরিক সাদৃশ্য আর দ্বিতীয়, এগুলোর মধ্যকার ক্রমিক নিয়মের অভিব্যক্তি।

এছাড়াও বহু সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে, সেগুলো বিজ্ঞানীদের এই মতবাদ রচনায় বাধ্য করেছে— পথ দেখিয়েছে। যেমন উচ্চতর জীব জন্তুর দেহে অনেক অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, অথচ, এগুলোই নিম্নস্তরের প্রাণীকুলের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয়। মানব দেহে প্রায় দুশ তন্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যা বর্তমান অবস্থায় আমাদের কোন কাজে আসে না। অথচ নিম্নস্তরের প্রাণীকুলের জন্যে সেগুলো অনেক জরুরী কাজ সুসম্পন্ন করে। কান দোলানো ও লোম খাড়া করার তন্ত্রগুলো এ পর্যায়ে গণ্য। এগুলো মানব দেহে রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে এগুলোর তেমন কোন কাজ নেই। Vermiform appendix ঘাষাশী জন্তুগুলোর জন্যে অত্যন্ত জরুরী অঙ্গ; মানুষের জন্যে তা অপ্রয়োজনীয়ই শুধু নয়, অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত মারাত্মক হয়েও দেখা দেয়। এজন্যে অনেকে আগেভাগেই তার অপারেশন করিয়ে নেয়। জীব বিজ্ঞানীদের মতে এই কীটাকার অন্ত্র সেই সময়কার স্মারক, যখন মানুষের পূর্ববংশ ঘাষ খেত। কেননা এই অন্ত্র ঘাষ চিবানোর জন্যে খুবই জরুরী। এমনকি মানুষের ঝরে যাওয়া লেজের চিহ্ন স্বরূপ মেদণ্ডের নিম্নাগ্রে কয়েকটি অস্থি বর্তমান রয়েছে, যা বুঝাতে চায় যে, মানুষ এক সময় লেজযুক্ত জীব ছিল। মানুষ এককালে যেসব পর্যায়ে ছিল, সেসব পর্যায়ের মধ্য দিয়েই বর্তমানে অন্যান্য জীব-জন্তু অগ্রসর হচ্ছে এবং এগুলোই তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বাস্তব প্রমাণ সহকারে। মানবদেহের এসব অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ করে লাল তার গ্রন্থের ৩৯ অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ

> আসলে এক ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবেই এগুলোর প্রত্যেকটিকে মানুষের দেহে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এগুলো তার দীর্ঘ অতীতকে প্রকট ও প্রকাশ করে। এদের এ ছাড়া অন্য কোন তাৎপর্য থাকতে পারে বলে মনে করা যায় না। (Organic Evolution, p-663)

ডারউইন লিখেছেন ঃ

> সমগ্র উচ্চতর গুণপনা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ এখন পর্যন্ত নিজের দেহের মধ্যে সেকালের অমোছনীয় চিহ্নসমূহ বহন করে চলছে; যখন সে নিম্নমানের জীবের আকৃতিতে ছিল। (Decent of man. P-244)

এই মতবাদটি সম্পর্কে একটা প্রশ্ন ওঠে। তাহলো ক্রমবিবর্তনের এই কার্যটি কিভাবে সাধিত হয়েছে ? এর কার্যকলাপ ও অনুপ্রেরক কি ছিল ? এই প্রশ্নের জবাবে অনেকগুলো মতবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। লাল তাঁর লিখিত Organic Evolution গ্রন্থে ছয়টি কারণের উল্লেখ করেছেন। তার সারনির্যাস হলো, প্রত্যেকটি প্রজাতির কতিপয় ব্যক্তিসত্তার মধ্যে কিছু পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন কিছু সংখ্যক অন্যান্যদের অপেক্ষা অনেক বড় হয়ে যায়। কতকগুলো অধিকতর তীক্ষ্ম ও শক্তিশালী হয়। এগুলোর এই পার্থক্যধর্মী বিশেষত্ব প্রজনন ও বংশানুক্রমিকতার মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। আর পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় এবং নৈসর্গিক ঘটনা-দুর্ঘটনাসমূহে পার্থক্যধর্মী বিশেষত্ব সম্পন্ন এই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাগুলোই রক্ষা পায় এবং বেঁচে যায়। এই কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলতে থাকে এবং প্রত্যেক পরবর্তী বংশে পূর্ববর্তী বংশের পার্থক্যধর্মী বিশেষত্বসমূহ বারবার সংরক্ষিত হতে থাকে এবং এভাবেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকাল পরে সে বিশেষত্বগুলো এত বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত হয়ে যায় যে, পূর্ববর্তী প্রজাতির ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর প্রজাতীয় রূপ পরিগ্রহ করে নেয়।

এই পার্থক্যধর্মী বিশেষত্বসমূহ কেমন করে উন্মোচিত হয় ? এই পর্যায়ে প্রথমে এই ধারণা উপস্থাপিত করা হয়েছিল যে, অঙ্গ-প্রতঙ্গের ব্যবহার ও অপব্যবহার কিংবা বাহ্যিক পরিপার্শ্বিকতাই এগুলোর স্রষ্টা। পরে অপর একটি মতবাদ দাঁড় করানো হয়েছে, তা হচ্ছে, এই পার্থক্যটা ক্রমাগতভাবে কোন প্রজাতির কতিপয় ব্যক্তিসত্তা লাভ করে বসে। কিন্তু আধুনিকতম মতবাদ এই দুইটিকে একত্রিত করে দিয়েছে। সিম্পসন তাঁর Meaning of Evolution গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

বিবর্তন সংক্রান্ত মতবাদ পর্যায়ে দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার পর কথাবার্তা এখানে এসে ঠেকেছে যে, ক্রমবিকাশমূলক পরিবর্তনসমূহ জন্মগতভাবে স্বতঃই প্রকাশমান হয়ে পড়ে। অথবা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে কোন বংশের কতিপয় ব্যক্তিসত্তা তা লাভ করে বসে। অর্থাৎ জীবনের অভিব্যক্তিমূলক ইতিহাসে যে সব চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী কার্যকারণ সক্রিয় হয়ে রয়েছে তা অভ্যন্তহীন ছিল, অথবা ছিল বাহ্যিক। এক্ষণে একথা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই বিরোধের আলোচনা সম্পূর্ণ অর্থহীন। এ দুটি দৃষ্টিকোণের কোন একটিতেও প্রকৃত সত্য নিহিত নেই। বরং তা তৃতীয় দৃষ্টিকোণে নিহিত রয়েছে। আর তা হচ্ছে, অভিব্যক্তির কার্যক্রমে উভয় ধরনের প্রভাব কার্যকর রয়েছে। (পৃ. ৮৭)

পর্যালোচনা

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে অত্যন্ত সহজ সরল ও সাধাসিধা ভঙ্গিতে বিবর্তন বা অভিব্যক্তিবাদ পর্যায়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি। বিস্তারিত ও পুংখানুপুংখ পর্যালোচনা বা সমালোচনা এখানে সম্ভব নয় বলে মাত্র কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করছি।

১. বিভিন্ন প্রাণীর উচ্চ নিম্নস্তরের বিন্যাস সর্বপ্রথম আলোচ্য, এই ধরনের বিন্যাস ও পরম্পরা দাঁড় করানো সামষ্টিক অর্থে ঠিক কিনা, সে প্রশ্ন না তুলে আমরা এই প্রশ্ন তুলতে চাই যে, নিছক এই বিন্যাস বা পরম্পরা এ কথা কি করে প্রমাণিত করতে পারে যে, প্রত্যেকটি পরবর্তী প্রজাতি পূর্ববর্তী প্রজাতি থেকে নির্গত হয়েছে ? এই মতবাদকে বাদ দিয়ে যদি দাবি করা হয় যে, প্রত্যেকটি প্রজাতি কালগত বিন্যাস বা পরম্পরা অনুযায়ী আলাদা আলাদাভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাহলে পূর্বোক্ত প্রকল্পটির অগ্রাধিকার পাওয়ার এবং একটির তুলনায় সেটিকেই সত্য ও সঠিক মেনে নেয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? এই শেষোক্ত প্রকল্পটিকে ভুলই বা বলা হবে কোন যুক্তিতে ? এহেন অবস্থার একটা ব্যাখ্যা এরূপও তো দেয়া যেতে পারে যে, নিম্নতর ও উচ্চতর সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্যটা আসলে প্রজাতীয় পার্থক্য, কালগত বিন্যাস ও পরম্পরাই এগুলোর সৃষ্টিগত পরম্পরা প্রকাশ করেছে।

জীবনের সূচনাকালীন প্রাণী যদি সর্বপ্রথম অস্তিত্ব লাভ করতে পারে, তাহলে জীবনের অন্যান্য প্রকার ও প্রজাতিসমূহ প্রথমবারেই অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনি কেন ? সেরূপ অস্তিত্ব লাভ করা যে অসম্ভব বা অবৈজ্ঞানিক, তা মনে করা হবে কোন্ যুক্তির বলে ?

মাটির স্তর সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্যাদি থেকে জানা যায়, ভূপৃষ্টে সর্বপ্রথম নিম্ন শ্রেণীর জীবের অস্তিত্ব ছিল। উচ্চশ্রেণী জীবের আগমন ঘটেছে তৎপরবর্তীকালে। কিন্তু এ থেকে একথা কি করে প্রমাণিত হয় যে, শেষের দিকে আগত প্রাণী প্রথমে আগত প্রাণীকুল থেকে বংশানুক্রমিক ভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে ? এথেকে পর্যায়ক্রমিক আগমন বা অস্তিত্ব লাভের কথা তো প্রমাণিত হয়, কিন্তু তা অভিব্যক্তিমূলক জন্মলাভের প্রমাণ হয় কিভাবে ? সামুদ্রিক ভ্রমনের ইতিহাস বলে, প্রথম দিকে হালবৈঠাধারী নৌকা চালানো হয়েছে, পরে পালবাহী নৌকা ব্যবহৃত হয়েছে। এরপরে বাষ্প শক্তির বলে বড় বড় জাহাজ চালিয়েছে। এক্ষণে কি করে বলা যেতে পারে যে, এসব নৌকা জাহাজের প্রতি পরবর্তী বাহনটি পূর্ববতী বাহনটির গর্ভজাত ? তা কিছুতেই বলা যায় না। বরং সত্যি কথা হচ্ছে, প্রত্যেকটি বাহনই স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত ও ব্যবহৃত হয়েছে, পার্থক্য হচ্ছে আগে ও পরের মাত্র।

জীবাশ্ম (Fossile) অধ্যয়ন থেকে জানা গেছে, প্রাচীনতম কালে ভূপৃষ্টে এমন এমন অসংখ্য প্রজাতি বসবাস করত, যার অস্তিত্ব বর্তমানে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে সব সম্পর্কে এক্ষণে মনে করা হয় যে, তা বর্তমানের জীব-প্রাণীসমূহের অভিব্যক্তি পূর্ব আকৃতি ছিল। একটি যাদুঘরে হরিণ প্রজাতীয় জন্তুর তিনটি প্রস্তরায়িত মাথার খুলি পড়ে ছিল। তিনটি খুলিই সুবিন্যস্তভাবে একটির পর অন্যটি একই কাতারে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এই খুলিগুলো বাহ্যত একই ধরনের ছিল। অবশ্য এই তিনটি খুলির মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। প্রথম খুলিটির শিং ও পার্শ কপালের মধ্যকার দূরত্ব দুই ইঞ্চি পরিমাণ ছিল, দ্বিতীয়টিতে এই দূরত্ব দেড় ইঞ্চি পরিমাণ এবং তৃতীয়টিতে ছিল এক ইঞ্চি পরিমাণ। প্রাণী বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এটাই অভিভ্যক্তির অকাট্য প্রমাণ, একটি বংশজাত কিভাবে অভিব্যক্তির ধারা অবলম্বন করে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে, তা এ থেকেই জানা যায় বলে তাদের দাবি।

কয়েক টুকরা অস্থি বিভিন্ন স্থান থেকে কুড়িয়ে এনে একত্রিত করে মনে মনে সেগুলোর পারস্পরিক বিন্যাস ও পরম্পরা সাজানো সহজ হলেও বাস্তবতার সাথে তার দূরতম সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এইগুলো ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র প্রজাতি নয়, তার কি কোন প্রমাণ আছে ? এগুলোকে ক্রমবিবর্তনমুখী একটি প্রজাতির আগের পরের ব্যক্তি সত্তা ধরে নেয়ার পক্ষে কোন্ অকাট্য যুক্তিটি পেশ করা যেতে পারে ? আসলে এই অস্থিগুলোকে মিলিয়ে একটা মানসিক 'প্রকল্প'-কে মনে করানোর চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। অথচ এর অপর একটি ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে তদ্দ্বারা প্রকৃত সত্য অনুধাবন অধিকতর সহজসাধ্য।

২. জীব ও প্রাণীসমূহের দৈহিক যোগ্যতা ক্ষমতা পর্যায়ের পারস্পরিক সাদৃশ্যকে অভিব্যক্তিবাদের প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে।

আমেরিকার যাদুঘরে প্রাকৃতিক ইতিহাস পর্যায়ের যেসব জিনিস সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে তন্মধ্যে মানুষ ও ঘোড়ার দুটি কংকালও রয়েছে। একটা বিশেষ ভঙ্গিতে পরস্পর মিলিয়ে ও সাজিয়ে দুটিকে রাখা হয়েছে। দেখা যায়, ঘোড়াটি তার সম্মুখ ভাগের পা দুটিকে ঊর্ধ্বে তুলে পিছন দিকের দুটি পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর মানুষটির হাত দুখানি যথারীতি ঝুলিয়ে দেয়ার পরিবর্তে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। এরূপ দুটি কংকাল বাহ্যত পরস্পর সৌসাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। এতদ্বারা মানুষকে অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুর বংশধর বুঝানোই এর আসল উদ্দেশ্য। মানুষ দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে সোজা খাড়া হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। উভয়ই একই বংশজাত না হলে এতটা সৌসাদৃশ্যপূর্ণ হলো কি করে, তা বোঝানোই এর মূলে নিহিত একমাত্র ইচ্ছা।

কিন্তু মানুষ ও জন্তুর মধ্যে নিছক দৈহিক ও আকৃতিক সৌসাদৃশ্য উভয়ের অভিন্ন বংশজাত হওয়ার কথা প্রমাণ করতে পারে না। কেননা মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক বিশেষত্বে অন্যান্য সমস্ত প্রকারের জীব-জন্তুর ওপর এতটা প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, এদুটিকে কোন প্রকারে ও কোন উপায়েই পরস্পরের বংশধর প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়। প্লাস্টিক নির্মিত একটা মানবদেহ বাহ্যিক আকৃতির দিক দিয়ে প্রকৃত মানব দেহের সঙ্গে শতকরা একশ ভাগ সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও প্রথমটিকে একটা প্রকৃত মানব দেহ প্রমাণ

করার কি কোন উপায় থাকতে পারে ? উপরন্তু মানুষ ও জীব-জন্তুর দেহ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হলে; কিংবা বিশেষত্বের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ নৈকট্য পাওয়া গেলেও মানুষ অন্যান্য জীব-জন্তুর ঔরসজাত সন্তান, তা প্রমাণিত হয়েছে বলে কি করে দাবি করা যেতে পারে ? লক্ষ লক্ষ কাঁচা ইট স্তূপীকৃত করে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়। ইটগুলো দেখতে প্রায় একই রকম মনে হয়। তাই বলে এই ইটগুলোর প্রত্যেকটি অপরগুলোর গর্ভজাত— তা মনে করা যেতে পারে কি ? এগুলোর মধ্যে বংশানুক্রমিকতা ও প্রজন প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে বলে আজ পর্যন্ত কি কোন প্রমাণ পাওয়া গেছে ? সৌসাদৃশ্যের এরূপ অর্থ গ্রহণ বিজ্ঞানের কোন প্রতিষ্ঠিত সত্যের ওপর ভিতিশীল বলে দাবি করা যেতে পারে কি ?

এরূপ অবস্থায় একটা ব্যাখ্যা এতদপেক্ষাও সুন্দর ও অধিকতর যুক্তি সঙ্গতভাবে দেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে, জীব-জন্তুর স্রষ্টা ভাল করেই জানতেন যে, মানুষ ও জীব-জন্তুকে একই প্রকারের পরিবেশগত অবস্থার মধ্যে জীবন-যাপন করতে হবে, এই কারণে তিনি অতি স্বাভাবিকভাবেই এসবের দেহ-কাঠামোর মধ্যে বহুদিকের এককতা অভিন্নতা সৌসাদৃশ্য রেখে দিয়েছেন। জীবনের যদি বিভিন্ন ধরনের পার্থক্যপূর্ণ পরিবেশ পারিশার্শ্বিকতার মধ্যে জীবন-যাপন করতে হতো, তা হলে নিশ্চিয়ই এই সৌসাদৃশ্য রক্ষা করা হতো না, প্রত্যেকটির কাঠামোগত বিশেষত্ব সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হতো। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে, তাদের সবাইকে একই ধরনের ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে বংশানুক্রমে যুগের পর যুগ ধরে। এটাই তাদের নিয়তি, প্রাকৃতিক বিধান। এই কারণেই তাদের সকলের দেহ কাঠামোকে অভিন্ন মৌলিকতার অধিকারী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ভ্রূণের সৌসাদৃশ্য আছে বলে তার ভিত্তিতে এসবের একই বংশজাত হওয়ার কথা প্রমাণ করতে যাওয়া কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নেয়া যায় না। তা থেকে বড় জোর শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হতে পারে যে, বিভিন্ন প্রজাতি ক্রমবৃদ্ধি লাভের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে পারস্পরিক অভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। (অথবা বলা যায়, ভ্রূণের এই অভিন্নতা চোখে দেখা গেলেও তা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়)। পরে ক্রমবৃদ্ধি লাভের শেষ পর্যায়ে তাদের

মধ্যকার পার্থক্য অভিন্নতা স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাতে তারা সব একই বংশজাত এমন কথা তো কিছুতেই প্রমাণিত হতে পারে না। আসলে এই যুক্তি দেখিয়ে একটা প্রকৃত ব্যাপারকে ভিত্তি করে একটা সম্পূর্ণ ভুল ও অসত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. বিবর্তন বা অভিব্যক্তির কার্যকারণ অনুপ্রেরক পর্যায়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তা এর চেয়েও অধিকতর হাস্যকর।

এই দর্শনের প্রাণ হচ্ছে বিবর্তন ও পরিবর্তনের পার্থক্যধর্মী বিশেষত্ব সমূহ।

এ পর্যায়ে লাল্ লিখেছেন, কতিপয় ব্যক্তিসত্তার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হওয়াই বিবর্তন অভিব্যক্তির প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ তার বক্তব্য এই ঃ

'পরিবর্তন (variation) স্বতঃই বিবর্তন কার্যক্রমের কারণ। হতে পারে।' (Organic Evolution, P— 85)

'Animal Biolgy' গ্রন্থের লেখক হল্ডেন ও হাক্সলির ভাষায় 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' আসলে 'পরিবর্তনসমূহের নির্বাচন' (Selection of Mutations) এর নাম (Modern Scientific thought, P— 26) তারা আরও লিখেছেন, যন্ত্র নির্মাণের ইতিহাসে আমরা যেমন একটি বিকাশ মাত্র ও ক্রমউৎকর্ষমূলক কার্যক্রম লক্ষ্য করছি, মানুষ ও জীব-জন্তুর ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বিবর্তন সঙ্ঘটিত হয়েছে। অতঃপর লিখেছেন ঃ

> জীব-জন্তু ও যন্ত্রের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। যন্ত্রের নীল নকশা সরাসরি মানুষ নিজে তৈরী করে। অথচ জৈবিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে নক্শা প্রস্তুতকারীর (Designer) স্থান নিয়েছে পরিবর্তন (variation) যা প্রাণীকুলের মধ্যে সামগ্রিকভাবে কার্যকর। এই পরিবর্তনই প্রাথমিক পার্থক্য সৃষ্টি করে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের চালুনি তার ওপরই কাজ করে।' (Modern Scientific Thought, P—130)

এখানে একটা সত্য তত্ত্বকে ভিত্তি করে একটা ভুল যুক্তি অবতারণ করা হয়েছে। একই দম্পতিজাত চারটি সন্তান সর্বদিক দিয়ে এক ও অভিন্ন হয়না, একথা সত্য। এদের মধ্যে কিছু না কিছু বৈসাদৃশ্য অবশ্যই থেকে

যায়। এই কথাটি যতখানি সত্য, তার চাইতে অনেক বেশি ভুল হচ্ছে এই কথা যে, ছাগলের দেহকাঠামো বৃদ্ধি পেতে পেতে জীরাফের কাঠামো হয়ে যেতে পারে। উপরের প্রত্যেকটি কথা স্বকীয় পরিমন্ডলে সত্য। কিন্তু তার পরিধির বাইরে সেই সত্যই সুস্পষ্ট মিথ্যা ও অসত্যে পরিণত হয়।

এছাড়া যে সব পরিবর্তন উপার্জিত হয় বলে ধরে নেয়া হয়েছে তারও কোন তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়না। মনস্তাত্ত্বিক অধ্যয়ণ বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, ব্যক্তিসত্তার মধ্যে জন্মগতভাবে পূর্ব থেকেই যেসব বিশেষত্ব বর্তমান নেই তা কেউই পরবর্তীকালে নিজের মধ্যে অর্জন করতে পারেনা। তাহলে প্রাচীন জীবসত্তাসমূহ একটি প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার অভিনব ও বিস্ময়কর বিশেষত্বসমূহ নিজেদের মধ্যে কি করে সৃষ্টি করে নিতে সক্ষম হতে পারল ? প্রকৃতির অধ্যয়ন যে সম্ভাব্যতাকে আজ প্রমাণ করতে পারেনা, অতীতে সেই সম্ভাব্যতা বাস্তবায়িত হয়েছিল বলে আজ কোন্ দলিলের ভিত্তিতে দাবি করা যেতে পারে ?

প্রখ্যাত দার্শনিক হার্বার্টি স্পেন্সার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার অব্যবহারের বংশানুক্রমিক স্থানান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন, আমার হাত এতটা খাটো এই কারণে যে, আমার পিতা-মাতা তাদের হাত দ্বারা কোনরূপ শ্রমের কাজ করতেন না। বস্তুত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা অভিব্যক্তিকে বাস্তব সত্য প্রমাণ করার জন্যে কত যে হাস্যকর কথাবার্তা বলতে পারেন, তা উপরোক্ত উক্তি থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। স্পেন্সারের খাটো হাত যদি তাঁর পিতা-মাতা থেকে সত্যই উত্তরাধিকার সূত্রে হয়ে থাকে, তাহলে এই উত্তরাধিকার তার নিজের বংশধরদের মধ্যেও সংক্রমিত ও স্থানান্তরিত হওয়া অবধারিত ছিল। শুধু তা-ই নয়, প্রত্যেকটি বংশেই এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়া উচিৎ ছিল। এমনকি, যাদের কোন অঙ্গ কোন দুর্ঘটনায় পড়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে, তাদের বংশ অনুরূপ অঙ্গহীন মানুষের নতুন একটা প্রজাতি গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু তা যখন হয়নি, তখন এই প্রকল্পও ভিত্তিহীন হয়ে গেছে।[১]

১. বিবর্তনবাদ জীবন ও তার বাহ্য প্রকাশসমূহের যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছে, তাতে সুস্পষ্টরূপে দুইটি শূণ্যতা বিরাজ করে। একটি এই যে, এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বিবর্তনবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে, একটি কোন প্রজাতির অস্তিত্ব লাভের জন্যে একটা 'কারণ' থাকা অবশ্যক। বিবর্তনবাদ এমনিই একটি 'কারণ' চিহ্নিত করছে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে প্রজাতি সৃষ্টির মতবাদ কোন অনুভবযোগ্য ও জ্ঞানগত কারণ নির্ধারণ করছে না।

এর জবাবে বলতে চাই, এটাই যদি বিবর্তনবাদের বিশেষত্ব হয়ে থাকে, তাহলে কথাটি ঠিক এই পর্যায়ের মনে হবে, যেমন কেউ জীব সত্তার ব্যাখ্যায় বলে দিল, সমস্ত জিনিসই স্বীয় মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছে। আর এই কথা বলে যেমন মনে অহংকার বোধ করবে যে, সেতো জীবত্বের ব্যাখ্যা দিয়েই ফেলেছে। আসলে এই ব্যাখ্যাটি যেমন একটা মধ্যবর্তী কথা, পূর্বোক্তটিও তেমনি মধ্যবর্তী অবস্থার বিশ্লেষণ মাত্র। কিন্তু মধ্যবর্তী ব্যাখ্যা কখনই কোন প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব হতে পারেনা। বিবর্তনবাদীরা তাদের এই কথাকে আসল প্রশ্নের জবাব বলে অভিহিত করতে পারেন, যদি প্রথম জীবের অস্তিত্ব লাভের কারণসমূহ তাদের করায়ত্ত হয়ে থাকে। জীরাফ অন্যান্য ক্ষুরধারী চতুষ্পদ জন্তুর থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর ক্ষুরধারী চতুষ্পদ জন্তুগুলি হামাগুড়ি দিয়ে চলা জীবগুলো থেকে বের হয়ে এসেছে। এভাবে প্রতিটি প্রাণীর পশ্চাতে অপর একটি প্রাণী রয়েছে, তা-ই এর স্রষ্টা। বিবর্তনবাদীদের এই তত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রশ্ন জাগে, এই ধারাবাহিকতার পিছনের দিকে এসে যে প্রাণীটি পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে তার স্রষ্টা কে ? Pasteur একথা পূর্ণমাত্রায় প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, যে কোন প্রাণী-ই— এমনকি আনুবীক্ষণী পোকাও শুধু জীবনের সাহায্যেই জন্ম লাভ করতে পারে। তাহলে যে প্রাথমিক রূপ থেকে জীবনের সূচনা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে তাঁকে অস্তিত্বদান করল কে ? বিবর্তনবাদের দাবি অনুযায়ী জীবনের সমস্ত অতীত স্তর বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে বিরাজমান রয়েছে। তাহলে জড় যে জীবনটার সহসা আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিল, এক্ষণে সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছিনা কেন ?

বিজ্ঞানের নিকট এই প্রশ্নের কোন জবাব নেই। সিম্পসন যেমন বলেছেন, সর্বশেষ ও চূড়ান্ত মহাসত্য সম্পর্কে কিছু জানতে পারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও

আদিম নয়, মধ্যবর্তী ব্যাখ্যা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, স্বরূপের বিচারের এই ব্যাখ্যাধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে ভিন্নতর কিছু নয়।

তত্ত্বানুসন্ধানের আওতার বাইরে অবস্থিত। বরং সম্ভবত মানুষের কল্পনা শক্তিও সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। (১৩৪-৩৫ পৃ.) তিনি লিখেছেন ঃ

> জীবন কি করে সৃষ্টি হলো? এই প্রশ্নের সততানিষ্ট জবাব হচ্ছে, এই প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই। অবশ্য তার কিছু লক্ষণ-প্রতীকের কথা আমরা বলতে পারি'। (Meaning of Evolution (P-13)

'লক্ষণ আর প্রতীক' বলে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন ? সম্ভবত তা এই যে, পানির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে একটা বিশেষ কার্যক্রম চলার ফলে এই ঘটনাটি স্বতঃই সঙ্ঘটিত হয়েছে। সিম্পসন লিখেছেন ঃ

> 'জীবনের এক্কেবারে সেই প্রাথমিক রূপ যে কি ছিল বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত তা জানতে পারে নি। বর্তমান অবস্থায় তা কখনও জানা যাবে, তার-ও কোন আশা নেই। তবে আমাদের অধ্যয়ন এই সম্ভাব্যতার সাক্ষ্য দেয়— বরং এই শক্ত অনুমান পর্যন্ত পৌঁছে দেয় যে, জীবন অবৃদ্ধি প্রবণ উপাদান থেকে স্বতঃই (Spontaneously) অস্তিত্ব লাভ করেছিল। আর কোনরূপ অতি প্রাকৃতক শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিছক বস্তুগত কার্যক্রমের সাহায্যে এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছিল। এই অজানা সূচনা থেকে রূপান্তরিত হয়ে অন্যান্য সমস্ত জীব প্রজাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে।' (ঐ—১৭৬ পৃ.)

বস্তুবাদী বিজ্ঞানীদের এরূপ কথা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। ধর্ম যদি বলে যে, জীবন কোনরূপ পূর্ববর্তী অস্তিত্ব ছাড়াই একটা বিশেষ সময়ে প্রথমবারের মতো অস্তিত্বলাভ করেছিল, তাহলে বিজ্ঞানীরা তা শুনে নাক সিঁটকাতে শুরু করেন। কিন্তু বিজ্ঞানী বলে পরিচিত ও খ্যাতিপ্রাপ্ত লোকদের উক্তরূপ কথা সহজেই বোধগম্য হয়ে যায় এবং তারা 'মহাবিজ্ঞানী' বলে অভিনন্দিত হন। বস্তুত সিম্পসনের উপরোক্ত স্বীকারোক্তি এবং ধর্মের বক্তব্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। আসল কথা হচ্ছে, ব্যাপারটিকে মাঝখান থেকে না দেখে সামগ্রিকভাবে বিচার বিবেচনা করা হলে স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে জানা যাবে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ই 'বিশেষ সৃষ্টিকর্ম' (Special creation) স্বীকার করে। তবে পার্থক্য শুধু এটুকুই হয় যে, বিজ্ঞান শুধু প্রথম প্রাণী সম্পর্কে এই কথা স্বীকার করে, আর ধর্ম এই আকীদা বিশ্বাস করে জীব-জন্তুর সমগ্র প্রজাতি সম্পর্কে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞান জীবের প্রথম উন্মেষ বা প্রকাশের বিশ্লেষণে যে

ভিত্তিটিকে মেনে নিচ্ছে, জীবনের বাড়তি প্রকাশের বিশ্লেষণেও সেই ভিত্তিটিকে মেনে নিচ্ছে না কেন ?

এ পর্যায়ে সময়ের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অবান্তর ব্যাপার। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি প্রজাতি স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের সৃষ্টি কর্মে কতটা সময় লেগেছে, তা এক আপেক্ষিক প্রশ্ন। মূল বিষয়ের ওপর তার কোনই প্রভাব নেই বা তার সাথে এর কোন সম্পর্কও নেই।

প্রজাতিসমূহের অস্তিত্বের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তাও স্বীয় স্বরূপে ধর্মের দেয়া ব্যাখ্যা থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। বিবেচনা করা যেতে পারে, 'প্রজাতি' কাকে বলে ? ভূপৃষ্ঠে প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রকারের জীব পাওয়া যায়। এই সংখ্যার প্রত্যেকটি প্রাণী অন্যান্য প্রাণী থেকে কি সম্পূর্ণ ভাবে ভিন্নতর? ..... না নিশ্চয়ই নয়। এগুলো অসংখ্য দিক দিয়ে পারস্পরিক সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন। মাত্র কতিপয় দিকের পার্থক্যই তাদের আলাদা আলাদা প্রজাতি বানিয়ে দিয়েছে। এই প্রজাতীর পার্থক্য কি করে হলো ? আমরা বলব, প্রত্যেকটি প্রজাতি স্বীয় বর্তমান পার্থক্যপূর্ণ বিশেষত্বসহ প্রথম দিনই সৃষ্টি করা হয়েছে। বিজ্ঞানের দাবি হচ্ছে, শুরুতে একই প্রকারের জীবন ছিল, তার বংশধরদের মধ্যে কোন কোন কার্যকারণ হেতু পূর্ব পুরুষদের থেকে সামান্য সামান্য 'পার্থক্য' হতে থাকে। এই পার্থক্যই সূদীর্ঘকালের পরিক্রমায় কোন কোন ব্যক্তিসত্তায় প্রকট মাত্রায় একীভূত হয়ে গেল। আর তখনই তা স্বতন্ত্র একটা প্রজাতিরূপ পেয়ে গেল।

এ দুটি ব্যাখ্যার মাঝে পরিমাণগত পার্থক্য অবশ্য আছে, কিন্তু স্বরূপতার দিক দিয়েও কি কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ? কোন বংশের কতিপয় ব্যক্তিসত্তায় স্বীয় অপরাপর স্বজাতীয়দের তুলনায় যে পরিবর্তনটার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, যে কারণে তা সে বংশের অপরাপর 'ব্যক্তিসত্তা' থেকে স্বতন্ত্র বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, সে স্থলে যদি প্রজাতি শব্দটি বসিয়ে দেয়া যায়, তাহলে সহজেই জানা যাবে যে, প্রকৃত ব্যাপারের দিক দিয়ে ধর্ম ও বিজ্ঞানের বক্তব্যে কোন পার্থক্য নেই। ধর্ম 'প্রজাতি সৃষ্ট' বলে যে জিনিসটিকে বোঝাচ্ছে, ভিন্নতর শব্দের আবরণে।

নিষ্প্রাণ জগতে জীবনের প্রথম সৃষ্টি সাধনের কার্যকারণ যদি পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলে কার্যকর থাকে, তা হলে সেই কার্যকারণ অন্যান্য প্রকারের

জীবন সৃষ্টি কর্মে অক্ষম প্রমাণিত হবে কেন ? অনুরূপভাবে এ বিশ্বলোকে করা হয়েছিল, নির্মাণ সামগ্রীসমূহ কোত্থেকে সংগৃহীত হয়েছিল, প্রস্তরখণ্ডসমূহ একটির ওপর অপরটি এমন সুন্দরভাবে রক্ষিত হলো কিভাবে, ঠিক প্রয়োজন ও পরিমাণ অনুযায়ী কিভাবে তৈরী হয়ে গেল ? আর তাজমহল যদি স্বতঃই নির্মিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এ রকম আরও অসংখ্য ইমারত নির্মিত হতে থাকল না কেন এ যাবৎ পর্যন্ত? ..... ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি যদি এইসব এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রশ্নাবলীর সান্ত্বনাদায়ক জবাব দিতে সক্ষম হন তাহলে তাজমহলের নির্মিত হওয়ার দাবি মেনে নেয়া হবে। কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব দেয়া যদি তার পক্ষে সম্ভব না হয়— সম্ভব যে নয় তা তো সুস্পষ্ট— তাহলে উক্ত কথাটি একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন উক্তি হয়েই থাকবে, তার যথার্থতা কেউ মেনে নেবে না। উল্লেখিত প্রশ্নগুলো নিছক ব্যাখ্যামূলক নয়, এ হচ্ছে প্রদত্ত ব্যাখ্যার জবাবে দলীল প্রমাণের দাবি।

বিবর্তনবাদ সংক্রান্ত বিজ্ঞানাদের ব্যাখ্যার জবাবেও বহু সংখ্যক প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রশ্ন ওঠে, তা কি করে ঘটল, কল্পিত পরিবর্তনসমূহের মূলে কার্যকরণ ও অনুপ্রেরক কি ছিল ? অতীতে ঘটেছে বলে যে বিবর্তনমূলক কার্যক্রমকে মেনে নেয়া হচ্ছে, তাকে আজও এক্ষণে আমরা দেখতে পাচ্ছিনে কেন ? এই প্রশ্নগুলোর কোন যথার্থ জবাব দেয়া বিবর্তনবাদী জিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, জবাব দিতে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। এই কথার সত্যতায় একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। এই পর্যায়ে যতগুলো ব্যাখ্যা ও কারণ উপস্থাপিত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে স্বয়ং বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কোন একটি ব্যাখ্যায়ও সম্পূর্ণ একমত হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তার অর্থ হচ্ছে, বিবর্তনবাদী মতবাদ যুক্তির কষ্টিপাথরে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বস্তুবাদী বিজ্ঞানীদের নিকট এই মতবাদটি এতই প্রিয় যে, তাদের কামনা হচ্ছে, কোন যুক্তি বা প্রমাণ ছাড়াই তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া হোক। এই উদ্দেশ্যে একটি চাকচিক্যপূর্ণ ও প্রতারণামূলক ধারণাও রচনা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে এ. ঈ. মেন্ডারের বক্তব্য তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন ঃ

'আঙ্গিক বিবর্তন'বাদের দুটি দিক। একটি হচ্ছে— সমগ্র জীবন্ত সত্তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান আকার-আকৃতি ধারণ করেছে। বিবর্তনের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, বিবর্তন কি করে সঙ্ঘটিত হলো, তার কার্যকারণ ও অবস্থা কি ছিল ? জীবন্ত সত্তাসমূহের মধ্যে বিবর্তন কার্যক্রম চলেছে, এটা কোন নতুন প্রকল্প নয়। দুই হাজার বছর পূর্বে কোন কোন গ্রীক চিন্তাবিদ এই মতবাদ পেশ করেছিলেন। অতীতের দুই তিনটি বংশধরের জীবন-কালে নবতর ঘটনা ও বাস্তবতা বিপুল পরিমাণ ধরা পড়েছে। সেই অনুযায়ী পরীক্ষণ কার্যক্রম চালানও হয়েছে। এক্ষণে এই মতবাদটি সর্বতোভাবে সত্যায়িত ও যথার্থ মতবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সমর্থনে লক্ষ লক্ষ ঘটনার (Facts) সমাবেশ হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের হাজার হাজার বিশেষজ্ঞের অভিমত-ও এর পক্ষে পাওয়া গেছে। এহেন 'আঙ্গিক বিবর্তন' মতবাদটির বক্তব্য হচ্ছে, সমস্ত জীবন্ত প্রজাতি উদ্ভিদ ও জীবজন্তু— উভয়ই আজকের দৃশ্যমান আকার-আকৃতিতে চিরকাল বর্তমান ছিল না। বরং দীর্ঘ ইতিহাসের পরিক্রমায় ওরা অসংখ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে সাদাসিধা ও নিম্নমানের প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে অস্তিত্ব লাভ করে এসেছে। বিবর্তনের অপর অংশ ডারউইনবাদ বা 'নিউডারউইনিজম' প্রভৃতি নামে পরিচিত। বিবর্তন সংক্রান্ত এই দ্বিতীয় ধরনের মতবাদসমূহ জীবজন্তুর ক্ষেত্রে বিবর্তন কার্যক্রম চলেছে একথা বলার জন্য আসেনি, বরং এগুলো এই মতবাদের ব্যাখ্যা করে মাত্র যে, পরিবর্তনসমূহ জীবজন্তুর ক্ষেত্রে বিবর্তন কার্যক্রম চলেছে একথা বলার জন্য আসেনি, বরং এগুলো এই মতবাদের ব্যাখ্যা করে মাত্র যে, পরিবর্তনসমূহ এভাবে সাধিত হয়েছে। এই দ্বিতীয় দিকটির কোন কিছুই চূড়ান্ত ও অকাট্য বলে দাবি করার কোন জিনিস আমাদের হাতে নেই। আসলে এই ধরনের সব মতবাদ পরীক্ষাধীন রয়েছে, তাতে অনেক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। সর্বশেষ চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ মতবাদ পর্যন্ত পৌঁছবার জন্যে আমাদের চেষ্টা অব্যাহতভাবে চলছে। (Clear Thinking, P— 112-13)

এখানে 'বিবর্তন' ও 'বিবর্তনের কারণ প্রদর্শন' এই দুটি শব্দে যে বিভক্তি করা হয়েছে, তা বিভ্রান্তিকর। তার পরিবর্তে 'বিবর্তন' ও 'বিবর্তনের প্রমাণ'

এরূপ বলা হলে বিভক্তিটা উত্তমভাবে করা যায়। একব্যক্তি যখন বলে, জীবনের সমস্ত বহিঃপ্রকাশ (Phenomenon) বিবর্তনের ফসল, তখন সাথে সাথেই প্রশ্ন ওঠে, এই বিবর্তনটা কি এবং তা কিভাবে প্রাণীকুলের ওপর কল্পিত কার্যক্রম পরিচালিত করে ? এসব প্রশ্নের সান্ত্বনাদায়ক জবাব দিয়ে দিলে কথাটি মেনে নেয়া হবে। কিন্তু এসব প্রশ্নের যথার্থ জবাব দিতে না পারলে কার্যত আপনি এটাই প্রদর্শন করেন যে, আপনার দাবির স্বপক্ষে পেশ করার মতো কোন দলীলই আপনার নিকট নেই।

বস্তুত বিবর্তনের কার্যকারণ সুপরিজ্ঞাত ও সুনির্দিষ্ট না হলে স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, 'বিবর্তনবাদ' এখন পর্যন্ত প্রমাণের মুখাপেক্ষী। মনে হয়, বিবর্তনের এমন কোন রূপ এখন পর্যন্ত ধরা পড়েনি যা প্রকৃত পক্ষে এসব ঘটনা সঙ্ঘটিত করাতে সক্ষম, যা এই মতবাদটিতে দাবি করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় বিবর্তনবাদকে একটা প্রমাণিত সত্য বলে দাবি করা এবং বিবর্তনের কার্যকারণসমূহ এখন পর্যন্ত বিবেচনাধীন বলা মূলত একটা প্রমাণহীন দাবি মেনে নেয়ার জন্যে চাপ প্রয়োগ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেউ যদি বলে, এই যে লক্ষ লক্ষ রেল ইঞ্জিন দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে, আসলে এগুলো বড় বড় লৌহপিন্ড অবস্থায় পড়ে ছিল। পরে তা স্বতঃই সক্রিয় ও গতিশীল হয়ে তীব্রগতিতে দৌড়াতে শুরু করে দিল। পূর্বোদ্ধৃত কথাটি ঠিক এই শেষোক্ত কথাটির মতোই। এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি কি করে ঘটল, লোকটিকে এই প্রশ্ন করা হলে সে বলে, 'আমি এই 'কি করে'র ব্যাখ্যা দিতে পারব না। তবে এ রকমটা যে হয়েছে, তা আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি।' এইরূপ কথা বিজ্ঞানীদের নিকট কি মর্যদা পেতে পারে।[১]

১. এই ধরনের কথাদ্বারা কোন 'বৈজ্ঞানিক সত্য' প্রমাণ করতে চাইলে তা যে কতটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায় তা বলে শেষ করা যায় না। ঠিক এই হাস্যকর অবস্থার মধ্যেই পড়ে আছে বিবর্তনবাদ— যা সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য বলে একালের একশ্রেণীর বিদগ্ধ লোকেরা স্বীকার করে গিয়েছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক স্যার আর্থার কিইথ এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ Evolution is unproved and unprovable. We believe it only because the only alternative is special creation and that unthinkable. অর্থাৎ বিবর্তন ধারায় গোটা সৃষ্টিলোক স্বতঃই গড়ে উঠেছে, একথা প্রমাণিত নয়, প্রমাণিত হতেও পারে না, এর পক্ষে কোন প্রমাণ দেয়াই যেতে পারে না। তা সত্ত্বেও

সত্যকথা এই যে, এরূপ অবস্থায় বিবর্তনবাদকে জীবনের প্রকাশমানতার একটা দিক 'মনে করে নেয়া' বিশ্লেষণই বলা যেতে পারে, 'চূড়ান্তভাবে' প্রমাণিত ও স্বীকৃত সত্য রূপে মেনে নেয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বিজ্ঞানীরা উপরোক্ত ধরনের বিভক্তি সৃষ্টি করে যেন একথাই বলেছেন যে, 'বিবর্তন মতবাদের পক্ষে আমাদের নিকট অকাট্য কোন প্রমাণ না থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি যে, সমস্ত জীবজন্তু বিবর্তনেরই উৎপাদন।'

জীবন সংক্রান্ত বিষয়াদিতে এ-ই যদি হয় বিজ্ঞানের ভূমিকা, তাহলে শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় বিশ্বাস ও বৈজ্ঞানিক সত্যে— ধর্ম ও বিজ্ঞানে পার্থক্যটা কি থাকল ? বিজ্ঞানও তো সৃষ্টি লোকের ব্যাখ্যাদানের জন্যে একটা 'বিশ্বাস'কেই দাঁড় করিয়েছে, যার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপনই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ এরূপ অভিযোগ আজ পর্যন্ত কেবল ধর্মের বিরুদ্ধেই তোলা হতো যে, 'ধর্ম কেবল বিশ্বাস করতে বলে, বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করে না।' ... এই অবস্থা বলতে বাধ্য হচ্ছি সমগ্র সৃষ্টি লোকের স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্বকে মানুষ এই কারণেই হয়ত কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে, কেননা, 'বিশ্বাস' সাধারণত এভাবেই দানা বেঁধে ওঠে। যদিও ইসলাম উপস্থাপিত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে সেকথা আদৌ প্রযোজ্য নয়।

আমরা তা মেনে নিয়েছি এজন্যে যে, তা যদি মেনে না নেই তা হলে কেউ বিশেষ ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছে বলে মানতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌কে তো এরা মানতে প্রস্তুতই নয়, সেই কারণেই না এই চরম অসত্য কথাটিকে পরম বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মেনে নিতে হচ্ছে নিরূপায়ের উপায় হিসেবে। .... চমৎকার বিজ্ঞান বটে।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ব

পরিচিতি

সিগ্‌মুন্ড ফ্রয়েড় (Sigmund Freud) অস্ট্রিয়ার মুরাভিয়া জিলার Freil Berg নামক ক্ষুদ্র জনবসতির এক মধ্যবিত্ত ইয়াহূদী পরিবারে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

বনী ইসরাঈলীরা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর সময় থেকে নিজেদের 'আল্লাহ্‌র প্রিয় জাতি' মনে করে আসছে। হযরত মূসা (আ)-এর 'প্রতিশ্রুত স্থান' অর্জন তাদের জাতীয় লক্ষ্যরূপে গণ্য। তারা দুনিয়ার যেখানেই বসবাস করুক এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যে নিজেদের বংশধরদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের স্বতন্ত্র বসতি বানিয়েছে। স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস ও বংশীয় অহমিকা ও আভিজাত্যবোধের কারণে তারা অ-ইয়াহূদীদের সব সময়ই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছে— বিশেষ করে খ্রিস্টানদের তারা কোন দিনই শুভ দৃষ্টিতে দেখেনি।

ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ হযরত ঈসা (আ)-এর সময় থেকেই চলে আসছে। ইয়াহূদীরা মনে করত, হযরত ঈসা মিথ্যামিথ্যি নবুয়্যাতের দাবিদার (নাঊযুবিল্লাহ)। তাঁর জন্ম সম্পর্কে তাদের কুৎসিত ধারণা ছিল অত্যন্ত প্রকট। তারা রোমান শাসকদের সাথে যোগসাজশ করে হযরত ঈসা (আ)-কে শূলে বসিয়েছিল। অতঃপর হযরত ঈসার সঙ্গী-সাথী অনুসারী ও প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টানদের ওপর অমানুষিক জুলুম ও নিপীড়ন চালিয়েছে অত্যন্ত নির্মমভাবে। এমন কি উত্তরকালে রোম যখন খ্রিস্টান আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হলো, তখন খ্রিস্টানরা ইয়াহূদীদের ওপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। ইয়াহূদীদের সর্বত্র প্রতিশোধমূলক নিষ্পেষণ চালানো হয়েছে। তাদের একটি অচ্ছুত জাতিতে পরিণত করা হয়েছিল। অত্যাচার ও উৎপীড়নের সে মর্মন্তুদ কাহিনী ইয়াহূদী বংশধরদের মন-মানসে

তীব্র প্রতিহিংসা জাগিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকটি ইয়াহূদীর মনেই এই প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ইসরাঈলী বংশের সন্তানরা এক তিক্ত বাস্তবতার শিকার। জন্ম মুহূর্ত থেকেই তাদের কর্ণকুহরে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় যে, তারা হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রিয় ও আদরের জাতি। আল্লাহ্‌র সার্বিক রহমত কেবলমাত্র এই জাতির জন্যেই নির্দিষ্ট। তারাই দুনিয়ার সেরা জাতি। কিন্তু বিবেক-বুদ্ধির উন্মেষ লাভের পর তারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তারা স্পষ্ট দেখতে পায়, তারাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত জাতি। অত্যাচার ও নিপীড়নের স্টীমরোলার তাদের ওপর দিয়ে অহর্নিশ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে, এই তাদের নিয়তি। ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়েও শাসক হয়ে মর্যাদার উচ্চতর আসনে আসীন হওয়া তাদের ভাগ্যে লেখা নেই।

বিশ্বাস ও বাস্তবের মধ্যকার এই পার্থক্য ইসরাইলী বংশের বিবেকবান শ্রেণীর লোকদের একদিকে আল্লাহ্‌র প্রতি নৈরাশ্যগ্রস্ত ও আল্লাহদ্রোহী ভাবধারা সম্পন্ন বানিয়ে দিয়েছে। আর অপরদিকে বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব বোধের (Superiority Complex) ফলে এই বংশে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয়কারী লোক সৃষ্টি করে দিয়েছে। তারা আল্লাহ বিমুখ, আল্লাহ্ অস্বীকারকারী হয়েও ধর্মীয় নেতৃত্বের অধীন বংশীয় আভিজাত্য ও প্রাধান্য সৃষ্টির আন্দোলনে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালনে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করছে না।

ফ্রয়েড এই পরিবেশেরই সৃষ্টি, এই পরিবেশেই লালিত পালিত বর্ধিত এবং এই ভাবধারারই মূর্ত প্রতীক। ফ্রয়েড আল্লাহ্ অবিশ্বাসী এবং ইয়াহূদী বংশীয় আভিজাত্যবোধে প্রচণ্ড ও রুদ্রমূর্তি। ফ্রয়েডের জীবনীকার ডঃ জোন্স লিখেছেন ঃ

> ফ্রয়েড আল্লাহ ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি অবিশ্বাসী হিসেবেই লালিত-পালিত। এসব বিশ্বাসের প্রয়োজন কখনই তার নিকট গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু নিজে ছিলেন আপাদমস্তক ইয়াহূদী। ইয়াহূদী হওয়ার ওপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে সামান্য ইঙ্গিতেও অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া গ্রহণের মতো ইয়াহূদী জনোচিত অনুভূতির তীব্রতা তার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান ছিল। তার অ-ইয়াহুদী বন্ধুদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য (৪৯ পৃ.)। তিনি ছিলেন

এমন নাস্তিক যে, কোনদিনই আল্লাহ বিশ্বাসী হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। (The Lfie and Works of Sigmund Freud— p. 55)

তরুণ ডাক্তার ফ্রয়েড চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করলে হিস্ট্রিয়া (Hysteria) রোগীদের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ও কৌতুহল লক্ষ্য করা যায়। অবিবাহিতা মেয়ে, যুবতী স্ত্রীলোক এবং দাম্পত্য জীবনে অ-সুখী নারীরাই ছিল তার বেশি সংখ্যক রোগী।

হিস্ট্রিয়া বা স্নায়ুবিক ব্যাধি, সেকালে তার রাসায়নিক চিকিৎসা ছিল সম্পূর্ণ অজানা। যাদু, তাবীজ ও টোট্কা চিকিৎসকদের ন্যায় ডাক্তারগণও এ রোগের চিকিৎসায় বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব সৃষ্টির চেষ্টায় ব্যাপৃত হতেন। সম্মোহনী পদ্ধতিতে (Hypnotism) ব্যক্তির ওপর যে বিস্ময়কর ধরনের প্রভাব বিস্তার করা হয়, তার নবনব প্রক্রিয়া উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। বহু সংখ্যক চিকিৎসক এই পদ্ধতি প্রয়োগে রোগীর চিকিৎসা করতেও শুরু করে দিয়েছেন। ডাক্তার ফ্রয়েড Doctor Joseph Bereuer -এর শিষ্যত্বে এই পদ্ধতির প্রয়োগ আরম্ভ করেন।

রোগ চিকিৎসার এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপায়ে রোগীর মোহনিদ্রার উৎপাদন করা হয়। পরে তাকে এ কথা বিশ্বাস করানো হয় যে, সে সুস্থ ও নিরোগ হচ্ছে। তার রোগ ক্রমশ দূর হয়ে যাচ্ছে। মোহনিদ্রায় রোগীর দুর্বল স্মরণশক্তি চিকিৎসকের বলিষ্ঠ চিন্তার প্রতাপে প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং সে রোগের নিরাময়তা অনুভব করতে শুরু করে। অন্যান্য ডাক্তারদের ন্যায় ডাক্তার ব্রোইওর ও ডাক্তার ফ্রয়েডও চিন্তা বিশ্বাসের এই প্রবল প্রভাবের সত্যতা স্বীকার করতেন।

'হিপ্নোটিজম' দ্বারা রোগীকে নিদ্রা ভারাক্রান্ত করা খুব সহজ কাজ নয়। সব রোগীই এই প্রভাব সহজেই গ্রহণ করে না। নিদ্রা ভারাক্রান্ত অবস্থা সৃষ্টিতে বারবার ব্যর্থ হওয়ার পর ডাক্তার ব্রোইওর ও ফ্রয়েড সহজতম প্রক্রিয়ার সন্ধান করতে শুরু করেন। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, সম্মোহনের সাহায্যে চিকিৎসকের চিন্তাধারা যদি রোগ নিরাময় করতে সক্ষম হয় তাহলে 'রোগ রোগীর বিশ্লিষ্ট-জটিল চিন্তার উৎপাদন' মনে করা যাবে না কেন ? আর রোগের কারণ এসব চিন্তার নিগূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান করতে দোষ কি ?

তারা রোগীকে প্রশান্ত অবস্থায় চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে চিন্তাসমূহের ধারা-প্রবাহ নিঃসংকোচে প্রকাশ করার নির্দেশ দিলেন। বললেন, কোন অবস্থারই যেন কোন অশোভন চিন্তা প্রকাশ করতেও একবিন্দু দ্বিধাবোধ করা না হয়। সবকিছুই যেন কোনরূপ কম-বেশি না করে অনর্গল বর্ণনা করে দেয়া হয়। এরূপ ক্রমাগত কয়েকটি বৈঠকে রোগীর চিন্তা-কল্পনা, আবেগ ও অভিজ্ঞতার এমন কতকগুলো দিক উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ল, যাকে রোগের প্রকৃত কারণ মনে করিয়ে দিয়ে রোগীকে নিশ্চিন্ত ও আশস্ত করে তুলতে তারা সমর্থ হলেন। তারা এই প্রক্রিয়াকে Psycho-Analysis বা 'মনস্তত্ব বিশ্লেষণ' নামে অভিহিত করলেন। উত্তরকালে এই পদ্ধতি সর্বজন পরিচিতি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক দর্শন

ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক মতবাদের সার হচ্ছে ঃ

১. মানব মন তিনটি বিভাগে বিভক্ত। Unconscious বা 'অবচেতন' হচ্ছে মনের সবচেয়ে বড় বিভাগ। আর তা-ই হচ্ছে মনের সমস্ত কামনা বাসনার আকর বা কেন্দ্রস্থল, সমস্ত আশা-আকাংখা লালসা-স্পৃহার মূল উৎস। মানুষের কামুক-লম্পট মন (Libido) সুখ-স্বাদ আস্বাদন ও ভোগ-বিলাস স্পৃহা চরিতার্থ করার উদগ্রতায় নিমজ্জিত হয়ে এখানে সেই একই ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে আছে। সন্তোষ বা সন্তুষ্টচিত্ততা অর্জনই তার একমাত্র জীবন-লক্ষ্য। কামনা-বাসনা-লালসা উপস্থাপিতকরণই তার সার্বক্ষণিক আকর্ষণীয় ব্যস্ততা। মনের দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে Pre-Conscious বা 'অনবচেতন' আর তৃতীয় বিভাগ চেতন বা Conscious নামে অভিহিত। 'চেতন' বিভাগে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমগ্র অনুভূতি অর্জন করে অনবচেতনার পথে অবচেতনের দিকে নিয়ে চলে যাই। সমস্ত হৃদয়াবেগ, চিন্তা-কল্পনা, পর্যাবেক্ষণ ও সমস্ত স্মৃতি অবচেতনে সমাধিস্থ, অনবচেতনের গবাক্ষপথ অতিক্রম করে চেতনের স্তরে ভাসমান হয়ে ওঠে।

২. অনবচেতনে সভ্যতা সংস্কৃতি নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার অনুভূতিসমূহ একটা পরীক্ষক বিবাচক (Censor) বিভাগ গঠন করেছে।

কামনা-বাসনা যখন অবচেতন থেকে ভেসে ওঠে 'অনবচেতনা'র গবাক্ষপথ পর্যন্ত চলে আসে, তখন 'অনবচেতনা'র পরীক্ষক-বিবাচক বিভাগ সে-সবের ছাটাই বাচাই করে উচিত চিন্তা-কল্পনা ও কামনা-বাসনাকে চেতনের স্তরে আবির্ভূত হবার অনুমতি দেয়। আর অনুচিত কামনা-বাসনা লালসা-স্পৃহাকে ধাক্কা দিয়ে অবচেতনের অতল-গহ্বরে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

৩. পাশবিক আবেগসমূহ ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায় মানুষের অবচেতনে বসে ক্রমাগতভাবে চিৎকার করে ও ছটফট করতে থাকে। তা চায় চেতন স্তরে আবির্ভূত হয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে ও ভাস্বর হয়ে উঠতে। কিন্তু সভ্যতা ও বিবাকের বিবাচক (Censor) অনবচেতন স্তরে দ্বাররক্ষীর মতো পথ রোধ করে দাঁড়ায়। আবেগ স্পৃহা বিবাচনের দ্বাররক্ষীকে প্রতারিত করার জন্য আশ্চর্যজনকভাবে বহুরূপ বেশ ধারণ করে, যেন কোন-না-কোনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়। ভুলভ্রান্তিপূর্ণ গতিবিধি, ঠাট্টাবিদ্রূপী রসিকতাপূর্ণ কথোপকথন, স্বপ্নজগত, পারিবারিক, বংশীয় ও জাতীয় কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, পূজা-পার্বন, ইবাদত— সবই এসে প্রচ্ছন্ন ও গোপন হয়ে থাকা আবেগসমূহের প্রকাশমানতার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বহুরূপী বেশমাত্র।

৪. যেসব চিন্তা, কল্পনা, আবেগ, আইন ও নৈতিকতার বিবাচকের দিক থেকে বারবার অবচেতনার স্তরে জোরপূর্বক পাঠিয়ে দেয়া হয়, তা ক্রমাগত অবদমনের দরুন ধীরে ধীরে অবচেতনার অতল গভীরে তলিয়ে গিয়ে পুঞ্জীভূত ও সুসংহত হয়। স্মৃতির বাইরে প্রচ্ছন্ন ও গভীর স্তরসমূহের নীচে চাপা পড়ে সমাধিস্থ থেকে তা নানা দ্বন্দ্ব ও প্রচণ্ড সংঘর্ষের (Conflicts) সৃষ্টি করে এবং তা-ই হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক বা স্নায়ুরোগ বা হিস্ট্রিয়া রোগের কারণ। মনস্তাত্ত্বিক রোগ স্বাভাবিক আবেগসমূহের অস্বাভাবিক বিবাচনের দরুন অবদমিত করে রাখার প্রতিক্রিয়া যেন। আর তা হচ্ছে প্রকৃতিকে প্রকৃতিপরিপন্থী পন্থায় চাপা দিয়ে রাখার শাস্তি।

৫. মনঃসমীক্ষণ বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (Psycho analysis) এসব রোগের কার্যকর ও সার্থক সফল চিকিৎসা।

৬. স্বপ্ন সমাধিস্থ আবেগসমূহের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, তা হচ্ছে কামনা-বাসনার অভিব্যক্তি। যা বিবাচনের নিদ্রাকাতর প্রহরীর চোখে ধুলি

দিয়ে রূপক ভাষা, চিত্রায়িত প্রচ্ছায়া, ইশারা-ইঙ্গিত ও রহস্যাবৃত কথাবার্তার মাধ্যমে অস্থির হৃদয়াবেগের কাহিনী বর্ণনা করে।

৭. প্রেম-ভালবাসা, ঘৃণা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, সাহস-হিম্মত, ভয়-ভীতি, দুঃখ-বেদনা, যৌন স্পৃহা-উত্তেজনা প্রভৃতি মানবীয় হৃদয়াবেগের রূপ বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এসবের উৎস হচ্ছে একটি মৌলিক আবেগ। আর তা হচ্ছে, যৌনস্পৃহা-কামনা-লালসা। সেই মৌল আবেগটি মানুষের শুক্রকীটের মধ্যে বিদ্যমান। তা ভ্রূণের সাথেই লালিত হয় এবং শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশমান হওয়ার জন্যে তৎপরতা শুরু করে দেয়। জন্মের পর শিশুর ক্রমবৃদ্ধি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যৌন স্পৃহা ও কামনার মধ্য থেকেই সমস্ত মানবীয় আবেগ ও ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করে। এমনকি উচ্চতর ধর্মীয় চিন্তা-কল্পনা বিশ্বাস ও উন্নতমানের আধ্যাত্মিক আবেগসমূহও এই নিম্নস্তরের হৃদয়াবেগেরই বিভিন্ন রূপ। আশা-আকাংখা ও স্বার্থলাভের যেসব আবেগ মানবীয় কর্মের মৌলিক প্রেরণাদায়ক ও চালিকাশক্তি বলে মনে করা হয়, তা-ও এই যৌন কামনা-লালসার আবেগ থেকেই উৎসারিত।

৮. যৌনকামনা-উত্তেজনা শিশুর জন্ম লাভের পর থেকেই প্রকাশমনতা লাভ করে। এই আবেগ নিয়েই শিশু তার জন্মদায়িনী মার দিকেও আকৃষ্ট হয় এবং তার সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক (Incest) দৃঢ় করে তুলতে চায়। কিন্তু যৌনাঙ্গের অপরিপক্কতা অদৃঢ়তার কারণে শিশু সঙ্গমকার্যে সক্ষম হয় না। ফলে তার যৌন-লালসা কামনা-বাসনা মা-প্রীতির রূপ পরিগ্রহ করে। শিশু যখন মা-কে পিতার দিকে আকৃষ্ট দেখতে পায়, তখন তার মধ্যে পিতৃবিদ্বেষ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। পিতাকে সে ঘৃণা করতে শুরু করে। মা-পুত্র ও পিতা-কন্যার মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক এবং পিতা-পুত্র ও মা-কন্যার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঘৃণার সুস্পষ্ট ভাবধারাকে ডাক্তার ফ্রয়েড নিজের একটা গৌরবময় আবিষ্কার বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এই ভাবধারার নাম দিয়েছে Oedipus Complex। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, 'স্রষ্টা' নিজেই মানুষকে এসব নিম্নস্তরের আবেগের আবর্তে নিক্ষেপ করেছেন। মানবতা তা থেকে কখনই নিষ্কৃতি পেতে পারে না। এ নিয়তির লিখন।

৯. চরিত্র আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সংশোধনী চেষ্টা-প্রচেষ্টা-আন্দোলন মানুষকে তার স্বভাবজাত হিংস্রতা থেকে

মুক্ত করে উচ্চে তোলার জন্যে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করেছে। কিন্তু এসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে এসব সাময়িক নিশ্চেষ্ট আবেগ সৃষ্টির অধিক কিছু করতে সমর্থ হয়নি। আর এই নিশ্চেষ্ট আবেগ কল্যাণকর হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিকরই হয় অধিক। যৌন-স্পৃহা ও নিশ্চেষ্টতা (Passiveness)-এর মধ্যেকার দ্বন্দ্বও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কাজেই ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শবাদ এমন একটা স্বপ্ন যা কোনদিনই বাস্তবায়িত হয়নি। তা একটা বিরাট মায়া (Great Illusions) মাত্র হয়েই রয়েছে চিরকাল।

পর্যালোচনা

ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক মতবাদের পর্যায়সমূহ ডারউইনের ক্রমবিকাশতত্ত্বের মতোই সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ মনে হয়। কিন্তু জীবনবিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতামূলক মনস্তত্ত্বের আধুনিক আবিষ্কারের আলোকে সেগুলোর সমালোচনা করা হলে তা নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হয়। ফ্রয়েড যে সময় মানব মানকে কাল্পনিকভাবে চেতনা, অবচেতন ও অনবচেতনা এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, তখন মানবীয় মগজের সংগঠন এবং তার কার্যক্রম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য খুব সামান্যই আয়ত্ত হয়েছিল। এই পর্যায়ে নিশ্চিত ও সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই জানা ছিল না। বিভাগগুলোর অস্তিত্ব এবং সেগুলোর কার্যক্রমের স্বরূপ ফ্রয়েড নিজেই কল্পনা করে নির্ধারিত করেছিলেন। তার স্বপক্ষে কোন অকাট্য প্রমাণ তাঁর নিকট ছিল না। মানব মনকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে কেন, পর্যবেক্ষণসমূহের স্মৃতি ও আবেক-উচ্ছ্বাসের শক্তিগুলোকে অবচেতনার অনুভূত অবস্থায় দ্বন্দ্ববান চাঞ্চল্যমূখর মনে করা হবে কেন এবং তা এক বিভাগ থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে স্থানান্তরিত হয় বা হতে পারে বলে ধরে নিতে হবে কোন কারণে, তার সুস্পষ্ট কোন জবাব ফ্রয়েডের নিকট নেই, পাওয়া যায়নি।

নির্ভরযোগ্য তথ্যের অনুপস্থিতিতে আবেগ, অনুসন্ধান, স্মরণশক্তি ও হৃদয়াবেগের কর্মতৎপরতার কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা করছিল। ফ্রয়েড স্বীয় কল্পনার ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা শেষ করে দিয়েছেন। উত্তর কালে তা জনপ্রিয়তা অর্জন করে একথা সত্য। কিন্তু জীবন-বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব

ও তথ্য ক্রমশঃ যতই বৃদ্ধি পেতে থাকল, এই ভিত্তিহীন কল্পনার অন্তঃসারশূন্যতা ততই স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে উঠল।

কতিপয় তাত্ত্বিক প্রশ্ন

ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ সম্পর্কে সার্থক পর্যালোচনা করার জন্যে নিম্নোদ্ধৃত বিষয়ে জীবন-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ববিশারদদের বিষয়গত তত্ত্ব ও তথ্যাবলী জানতে পারা আবশ্যক ঃ

১. পর্যবেক্ষণসমূহের রেকর্ড রক্ষার স্বরূপ কি ? এই রেকর্ড কি অবচেতনায় সদা কর্মতৎপর হয়ে থাকে ?

২. আবেগের নিগূঢ় তত্ত্ব কি ? মানবীয় মগজই আবেগের লীলাকেন্দ্র ? তা কি অবচেতনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারে ?

৩. মানবীয় মগজ সত্যিই চেতন, অবচেতন ও অনবচেতনের তিনটি বিভাগে বিভক্ত ? পর্যবেক্ষণসমূহের স্মৃতি ও আবেগসমূহ কি এই তিনওটি বিভাগে তিন দিক থেকে অপর দিকে স্থানান্তরিত হতে থাকে ?

৪. শিশুর যৌন কামনা ও ঈডিপাস কমপ্লেকস্-এর প্রকৃত তত্ত্বটা কি ?

৫. ফ্রয়েড় কল্পিত বিবাচন বিভাগের মৌলিকতা কি ? তিক্ত স্মৃতিসমূহ ও আবেগ বিবাচন বিভাগের চোখে ধূলি দিয়ে বহুরূপ ধারণ করতে সক্ষম ? নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার উপদেশ কি স্বাভাবিক আবেগকে অস্বাভাবিকভাবে দাবিয়ে রেখে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টি করার কারণ হতে পারে ?

৬. মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার প্রকৃত কারণ কি ? তার চিকিৎসার পন্থা বা পদ্ধতিই বা কি ? ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কি স্বার্থক চিকিৎসা পদ্ধতি বলে প্রমাণিত ?

৭. স্বপ্নের তত্ত্ব কি ? মনের কামনা-বাসনাই কি স্বপ্নের আসল কারণ ?

এই প্রশ্নসমূহের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

পর্যবেক্ষণ স্মৃতির স্বরূপ, আবেগের অবস্থা ও অবচেতনের তত্ত্ব সম্পর্কিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনসমূহ বহু জ্ঞানপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছে। আধুনিক উদ্ভাবনে প্রমাণিত হয়েছে, পর্যবেক্ষণসমূহ মনের পর্দার ওপর

লেখনি ছবির মতো নয়, চুম্বক শক্তি সম্পন্ন টেপ রেকর্ডিং এর রেখা চিহ্নের মতো স্বীয় বিশেষ সংকেত (Code) এমনভাবে অংকিত হয়ে যায় যে, তা যেন বর্ণমালায় লিখিত একখানি গ্রন্থ। এই লিখিত বিষয়াদি নিষ্প্রাণ কিতাবের মত মানুষেব মনে সংরক্ষিত থাকে এবং লাইব্রেরীতে রক্ষিত গ্রন্থাবলীর মতো তখন পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে থাকে যতক্ষণ তা কেউ হাতে নিয়ে পাঠ না করে। এ লেখাগুলো নিজস্ব শক্তি ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোন কাজ করার ক্ষমতা নেই। তা কোন অবচেতন এলাকায় কোনরূপ চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করতে পারে না। লাইব্রেরীতে রক্ষিত কোন বইয়ের কাগজের খণ্ড ও কালির রেখার অধিক কোন সারবত্তা নেই। গ্রন্থের জ্ঞানগত স্বরূপ এবং মূল্য কেবল তখনই জন্মে যখন কোন অচেতন ভাষাবিদ তা পাঠ করে ও অর্থ বুঝতে থাকে। অনুরূপভাবে মানব মনের কোন অংশে অংকিত পর্যবেক্ষণাদির রেকর্ডের রেখাসমূহ মানবীয় চেতন লক্ষ্যের আলোক রশ্মি তার ওপর নিক্ষেপ করে যতক্ষণ তা না পড়েছে, ততক্ষণ তা প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াহীন এবং অর্থ ও তাৎপর্যশূন্য। আবেগমূলক অভিজ্ঞতাসমূহের স্মৃতির অবস্থা তা-ই।

চেতনা মানবীয় মগজের একটা কার্যক্রম, মগজের কোন অংশ বিশেষের নয়। মগজে চেতন অবচেতনের কোন আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট এলাকা নেই। আবেগ ও চিন্তার স্মৃতিসমূহও এক এলাকা থেকে অপর এলাকায় স্থানান্তরিত হয় না। বরং এই স্মৃতিসমূহ স্মরণ-শক্তি গ্রন্থে নিষ্প্রাণ চিহ্ন ও নির্দশনাদির ন্যায় অংকিত হয়ে তথায়ই স্থিতিশীল হয়ে থাকে। এক দিক থেকে অন্য দিকে স্থানান্তরিত হওয়া কিংবা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার যোগ্যতাই তাতে থাকে না। চেতনা মানবীয় মগজে একটা বিশেষ অনুভূতি। তা তার লক্ষ্যের আলোকচ্ছটা স্মরণ-শক্তি গ্রন্থের কোন-না-কোন অংশের ওপর নিক্ষেপ করতেই থাকে। গ্রন্থের যে অংশের ওপর সে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত ও নিবদ্ধ হয়, তা অর্থ ও তাৎপর্যের পোষাক পরিধান করে চেতনে নতুনত্ব পায়। এই তাৎপর্যের পোশাক পরানোর কাজটি চেতন অনুভূতির করণীয়, পর্যবেক্ষণ স্মৃতির বা নিষ্প্রাণ রেকর্ডার-এর নয়।

আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, কতগুলো মাংস গ্রন্থিতে (Glands) সাময়িক রাসায়নিক কার্যক্রমের সাহায্যে কতিপয় বিশেষ

রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হওয়া এবং সেগুলির সাহায্যে মানবদেহে রাসায়নিক ভারসাম্যে পরিবর্তিত করারই নাম ভাবাবেগ (Sentiments)। ভাবাবেগময় মাংসগ্রন্থিসমূহে রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করা কিংবা তা আটকে রাখার নিয়ন্ত্রণশক্তি মানবীয় মগজের একটা বিশেষ স্থানে বিরাজিত। এই নিয়ন্ত্রণশক্তি প্রকৃতিগতভাবে কাজ করে। মানুষের সাময়িক বিশেষ পরিবেশের আনুকূল্যে বিশেষ মাংসগ্রন্থিতে রাসায়নিক কার্যক্রমকে জারী করে ও আটকে রাখে। কিন্তু এই রাসায়নিক আবেগ কার্যকারণ সৃষ্টিকারী মাংসগ্রন্থিসমূহ মগজের বাইরে অবস্থিত। আর তা যে রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে, তা-ও রক্তের আবর্তন ও প্রবাহের সাথে মিলিত হয়ে দেহে আবেগময় অবস্থার সৃষ্টি করে, মগজে সংক্রমিত হয় না। অতএব হৃদয়াবেগের অবস্থানস্থান মগজ নয়, দেহ। মগজ পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি সমূহের রেকর্ড করার ন্যায় ভাবাবেগের অনুভূতিও রেকর্ড করে। আর এসব মাংসগ্রন্থির কার্যগতিরও নিয়ন্ত্রণ করে। তা-ই ভাবাবেগময় রাসায়নিক বস্তু সৃষ্টি করে। কিন্তু মগজ না ভাবাবেগের উৎপাদক, না তার অবস্থানস্থান। উৎপাদক হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মাংস গ্রন্থিসমূহ। আর মানব দেহের বিভিন্ন অংশ হচ্ছে তার অবস্থান স্থান। এই অংশসমূহই সাময়িকভাবে সেসব রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশেষ অবস্থার প্রকাশ ঘটায়। অন্যান্য সমস্ত ভাবাবেগশূন্য পর্যবেক্ষণ ও অবস্থাসমূহ রেকর্ড করার মতো মগজের কাজ হচ্ছে ভাবাবেগপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও অবস্থাসমূহকেও তেমনিভাবে রেকর্ড করা। এভাবে ভাবাবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতাসমূহের যে রেকর্ড মগজে থেকে যায়, তা অন্যান্য ভাবাবেগশূন্য পর্যবেক্ষণসমূহের রেকর্ডের ন্যায় নিষ্প্রাণ Code-এর রূপেই থাকে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, স্মরণ শক্তি যখন এসব ভাবাবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতার স্মৃতি নতুন করে নেয়, তখন ভাবাবেগপূর্ণ অবস্থাও তাজা হয়ে ওঠে। কেননা তার স্মরণের বিশেষ স্বরূপটাই এই।

মানবীয় লালন-প্রশিক্ষণ যখন মানব মনে কোন বিশেষ কাল্পনিক পরিবেশ সৃষ্টির যোগ্য হয়ে যায়, তখন এই কাল্পনিক পরিবেশও বাহ্যিক প্রকৃত পরিবেশের ন্যায় ভাবাবেগপূর্ণ মাংসগ্রন্থিসমূহের নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। আর আমরা আমাদের মনে ভয়, ক্রোধ, দুশ্চিন্তা ও প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি ধরনের কাল্পনিক দৃশ্য সৃষ্টি করে প্রকৃত ভয়, ক্রোধ, দুশ্চিন্তা ও প্রেম-ভালবাসার ভাবাবেগকে আলোড়িত করতে পারি। কিন্তু এই

কাল্পনিক কারণকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী চিন্তাসমূহকে তখন চেতনা লক্ষ্যের আলোকচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত থাকতে হবে। নতুবা কোন ভাবাবেগ-ই আত্ম-প্রকাশ করবে না। ফ্রয়েডের অবচেতনে সার্বক্ষণিক ভাবাবেগের অস্তিত্বের কল্পনা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন, ভাবাবেগসমূহ সক্রিয় করা ও স্মৃতিসমূহ নতুন করে জাগরূক করা উভয় চেতনমূলক কার্যক্রম। অবচেতনমূলক নয় আদপেই। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত লক্ষণীয় ঃ

অবচেতন

'অবচেতন' (Unconscious) সম্পর্কে প্রখ্যাত আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক যোসেফ জ্যোস্ট্রো (Joseph Jastrow) তার সমালোচনা গ্রন্থ Ereud : his Dream and sex Theories-এ লিখেছেন ঃ

'অবচেতন মন ফ্রয়েডীর মতাদর্শের ভিত্তিগত প্রকল্প। তাকে বাদ দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অসম্ভব। ফ্রয়েডের গোটা আন্দোলনই চলেছে এরই ওপর ভিত্তি করে। আসলে এ একটি প্রকল্প মাত্র। মৌলিক প্রশ্নের এ হচ্ছে খুব চালাকিপূর্ণ জবাব। কিন্তু যেহেতু কয়েকটি ব্যাপারের বিশ্লেষণের জন্যে এই প্রকল্প আমাদের জন্যে জরুরী, শুধু এই কারণে তো আমরা অবচেতন মনের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারিনে। প্রাচীনকালে হিস্ট্রিয়া ও অনুরূপ রোগ-ব্যাধির ব্যাখ্যা করা হতো এই বলে যে, তাকে জ্বিনে ধরেছে বা তার ওপর ভূত-প্রেতের ছায়া পড়েছে। জ্বিন-ভূত বলতে কিছু আছে তা মেনে নিতে যদি আপনি প্রস্তুত হন এবং এ সব কষ্টদায়ক রোগ-ব্যাধি দিয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়া সেগুলোর স্বভাব-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করেন, তাহলে এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। অথচ যাদুকর স্ত্রী লোকদের এসব প্রকল্পের জন্যে অপরাধী সাব্যস্ত করে মেরে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের মন এরূপ অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ গ্রহণ করছে না— হুডমান-এর মতবাদও অনেকটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তিনি প্রবল সাহসিকতাসহকারে ঘোষণা করেছিলেন যে, আমাদের দুটি মন। একটি সহজাত, একটি সচেতন, তা সেই সব রহস্যময় ও অসাধারণ কার্যাবলীর জন্যে দায়ী, যার কোন ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি নে। যদি বাস্তবিকই আমাদের মন দুটি হয়ে থাকে, আর

এ-ই যদি তার কর্তব্য, তাহলে মনোবিজ্ঞান কিছুটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পেয়ে যেতে পারে এবং তা জ্বিন ও ভূতের প্রকল্পের তুলনায় অনেকটা ভাল। যদিও যুক্তি প্রমাণ বলতে তার পক্ষে কিছুই নেই। হুডমান-এর মতবাদ ছিল বিজ্ঞান বর্হিভুত। যদিও তিনিও সহজাত বৃত্তির সাহায্যে রোগ চিকিৎসার একটা পন্থা প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তা 'অবচেতনের' ইতিহাসের একটা 'ভ্রান্ত অধ্যায়' হয়ে রয়েছে। ফ্রয়েডের অবচেতনের পক্ষেও কোন স্বভাবসম্মত ভিত্তি উপস্থাপিত করা আবশ্যক। নতুবা তা-ও এই ভ্রান্ত গ্রন্থের একটি অধ্যায় হয়ে থাকবে। ডালপন বলেন ঃ ফ্রয়েডের 'অবচেতন' মনেরও প্রকৃতপক্ষেই কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তার মতো এটা ভূতের প্রচ্ছায়া কিংবা 'হুডমান-এর সহজাত' এর মতোই প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মনস্তাত্বিক চিকিৎসকদের অনেকেই বলেন, 'অবচেতনে'র কিছুটা ভিত্তি থাকলেও তার প্রমাণ সাক্ষ্য এতই দুর্বল যে, ফ্রয়েডীয় অবচেতন কোনক্রমেই সমর্থন করা যেতে পারে না।

(পৃ. ১৫১-১৫২)

এরপর দীর্ঘ আলোচনা শেষে অধ্যাপক জ্যেস্ট্রো নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এই বলে ঃ

আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছতে বাধ্য হয়েছি যে, ফ্রয়েডের অবচেতন একটি ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী মাত্র।

আমেরিকার প্রখ্যাত মনস্তত্ববিদ অধ্যাপক রবার্ট উড্ওয়ার্থ এবং অধ্যাপক ডোনাল্ড মাক্ কুইন্স Psychology নামক পাঠ্য-পুস্তক লিখেছেন ঃ

আমরা যা কিছু শিখি তা মনে কিভাবে সংরক্ষিত হয় ? এ প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ বলেছেন, তা অবচেতনে সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু এই রহস্যময় কথাটির তাৎপর্য কি ? তার তাৎপর্য হয় 'অবচেতন কর্ম' হতে পারে, নতুবা হবে 'অবচেতন নিষ্কর্মতা।' অবচেতন কর্মের অর্থ হচ্ছে, একটা বালক পূরণের নামতা শিখে নিয়ে মনে মনে তা সব সময়ই আওড়িয়ে চলেছে, যদিও অবচেতনভাবে। আর যেহেতু এই বালকটি বরফের উপর পিছলানো, সাতার কাটা ও গাছে চড়াও শিখে নিয়েছে, তাই এসব কাজেরও সে ধাবাবাহিকভাবে পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। শিখে নেয়া সব গানও সে গাচ্ছে। আর যত লোককে সে অতীতে দেখেছে, নিজের মনে

মনে তাদের পরিচয় স্মরণ করছে ইত্যাদি ... ইত্যাদি.....। স্মরণের সংরক্ষণ সংক্রান্ত এই মতাদর্শে সমস্ত শিখে নেয়া কথাসমূহ ক্রমাগত মানসিক পুনরাবৃত্তি কাজের দাবি করে, তা নিজের বোঝার চাপে পড়ে নিষ্পেষিত হতে বাধ্য হয়। কিন্তু স্মরণীয় সংরক্ষণ যদি 'অবচেতন' 'নিষ্কর্মতা' হয়, তা হলে তাতে 'নির্জ্ঞান' বা 'অবচেতন' শব্দটিই অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীও বটে। কেননা স্মরণ সংরক্ষণের রূপটি তখন এই হবে যে, শেখার প্রতিটি কর্ম মানুষের মস্তিষ্ক সংগঠনের মৌল বস্তুতে কোন পরিবর্তন ঘটায়। আর মৌল বস্তুর এসব পরিবর্তন স্থায়ী হয়ে থাকে ও তখন পর্যন্ত 'নিষ্কর্মা' থাকে, যতক্ষণ কোন প্রভাবশালী উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত না করা হবে। চর্চা ও পুনরাবৃত্তিও মস্তিষ্ক সংগঠনের মৌল বস্তুতে পরিবর্তন সাধন করে। সে পরিবর্তনসমূহ পরিমাণে অনুবীক্ষণী অণুসমূহের তুলনায়ও ক্ষুদ্রতর হয়ে থাকে। তবে এতটা অবশ্যই হয় যে, মানুষ যা কিছু শিখেছে তা পুনরাবৃত্তি করতে পারে। আর যেভাবে দেখতে শিখেছে সেভাবেই সে দ্রব্যসমূহকে পুনরায় দেখতে পারে।' P.-549

অধ্যাপক Brianm Foss তাঁর New Hrizons in Psyochology গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'চক্ষু যেহেতু কয়েকভাবে ক্যামেরা সদৃশ এবং পর্যবেক্ষণ ছবি সদৃশ, এই কারণে পর্যবেক্ষণ এক ধরনের ফটোগ্রাফী কর্ম মনে করা কি উচিত হবে না, যার মধ্যে বহির্বিশ্বের প্রতিকৃতিসমূহ তাৎক্ষণিক ও হুবহু মস্তিষ্কের কোন অংশে প্রতিবিম্বিত হয়ে যায় ?' দুর্ভাগ্য এই যে, এর জবাব স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে নেতিবাচক। প্রতিবিম্বিত ছবির সাথে সাদৃশ্য পর্যায়ে বলতে হলে এ-ই বলা যায় যে, পর্যবেক্ষণ আর যা-ই হোক প্রতিবিম্বিত ছবি কখনই নয়। এই সাদৃশ্য সম্পূর্ণ স্থূল ও বিভ্রান্তিকর (৪৫ পৃ.)। দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের পর্যবেক্ষণমূলক জ্ঞানের শতকরা নব্বুই ভাগেরও বেশি অংশ আমরা চক্ষুর মাধ্যমে লাভ করি। আর জ্ঞানের জগতে একালের কতগুলো বড় বড় অগ্রগতির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি এ বিভাগে এই হয়েছে, চক্ষুর ভিতর থেকে প্রতিবিম্বিত ছবি মস্তিষ্ক পর্যন্ত কেমন করে স্থানান্তরিত হয় ? স্নায়ূতন্ত্রীর (Nerves) সাহায্যে স্থানান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে আমাদের জানা মতে বলতে পারি, এটা তো আমরা

জানি যে, চক্ষুর পশ্চাতের ঝিল্লির ওপর প্রতিফলিত দৃশ্য-অবস্থা স্নায়ুতন্ত্রীসমূহের মধ্যে বৈদ্যুতিক রাসায়নিক কর্মকে প্রভাবিত করে। আর এই প্রভাব-প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের Optical Cortex পর্যন্ত গিয়ে পৌছায়। দীর্ঘকাল ধরে মনে করা হচ্ছে, আমরা যখন চক্ষু-পর্যবেক্ষণ করি তখন চক্ষুর অভ্যন্তরে পর্যবেক্ষণ ছবির সম্পূর্ণ অনুরূপ এটা উপরিতল সম্পন্ন চিত্ররূপ মস্তিষ্কে অংকিত হয়ে যায় হয়ত। কিন্তু মস্তিষ্ক চক্ষুর সাহায্যে যে সাদাসিধা প্রতিবিম্বিত ছবি অর্জন করে, তার সাহায্যে সমস্ত চক্ষু-পর্যবেক্ষণাদির বিশ্লেষণ করা যায় বলে মনে করা এক্ষণে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্লেষণের যে চিত্রটি এক্ষণে উদ্ভাসিত, তা অকথ্যভাবে জটিল। সে অনুযায়ী চক্ষে উত্তরিত ছবির 'স্থানান্তর' (Reflexion) আসলে কয়েকটি বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সর্বপ্রথম স্বয়ং চক্ষুর পিছনের ঝিল্লীর উপর, তার পরে চক্ষুর স্নায়ুতন্ত্রীতে, তারও পরে Lateral Geniculate Bodies এ, আর শেষ পর্যন্ত Cerebral Cortex এর ওপর। আর বিস্ময়কর কথা হচ্ছে, দৃশ্যের ছবি ও মস্তিষ্ক বহিঃস্তরে তার প্রভাব পড়ার সম্পর্ক কয়েকটি দিক দিয়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে হয়ে থাকে।

'প্রতিবিম্বিত ছবিরা প্রাচীন ধারণার প্রেক্ষিতে পরিকল্পিত ছিল। (P. 19)

আর অধ্যাপক উইলিয়ম বেক, তার Modern Science and the Nature of Life গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'কোন পর্যবেক্ষণ কিংবা অভিজ্ঞতা যখন তার স্মৃতি রেখে যায়, তখন তার মস্তিষ্কে তার কোন চিত্র থেকে যাওয়া আবশ্যক। আধুনিক সাক্ষ্য-প্রমাণ তাই প্রমাণ করে। কেননা একথা প্রমাণিত যে, সমস্ত স্তর ও পর্যায়ের ওপর মস্তিষ্ক তৎপরতা ভূত প্রেতের প্রচ্ছায়ার মতো নয়, মস্তিষ্ক মৌল বস্তুর অনুগুলোর প্রতিফলনের নমুনা বিভিন্নরূপে হয়ে থাকে। এসব সূক্ষ্ম বস্তুগত চিত্রকে ছোট-বড় ভেসে ওঠা দৃশ্যবলীর মত মনে করা, যা মাথার খুলির মধ্যে তারও দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে, জরুরী নয়; বরং এই কর্ম চুম্বক শক্তিসম্পন্ন টেপ রেকর্ডিং-এর কার্যক্রমের সাথে নিকট-সাদৃশ্যসম্পন্ন। এভাবে স্মৃতি ও বিজ্ঞানের ভিত্তিসমূহ দেহসম্পন্ন বস্তুতেই সংস্থাপিত। পৃ. ৪৪

'চিকিৎসকরা লক্ষ্য করেছেন, মস্তিষ্কের নিম্নাংশে কোন ফোঁড়া হলে তা রোগীর খাদ্যলিপ্সা অসীম মাত্রায় বৃদ্ধি করে দেয়। রোগী খাবার খেতে

থাকে, কিন্তু তবু তার তৃপ্তি হয় না। কিছু লোক মনে করেছেন, পিটুইটারী তন্ত্রীর ক্ষতি সাধিত হওয়ার দরুন এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ পেটের অন্ত্রতন্ত্রী মস্তিষ্কতন্ত্রীর অংশ নয়। মস্তিষ্কের ঠিক নিম্নস্থানে তা এমন তন্ত্রী, যা মস্তিষ্ক ও দেহের অন্যান্য সমগ্র মাংস গ্রন্থীসমূহের মধ্যে— যা হরমন সৃষ্টি করে— মাধ্যমের কাজ করে। অন্যান্য কিছু লোক মনে করেছেন, খাদ্যলিপ্সা বৃদ্ধির জন্য Hypothalamus-ই দায়ী। আর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, এই শেষোক্ত মত-ই ঠিক। Hypothalamus মস্তিষ্কের একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা মস্তিষ্কের নিম্নতলায় সেই পথের অতি নিকটে অবস্থিত যা আসল মগজকে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত করে। তা পিটুইটারী তন্ত্রীসমূহের উপরিভাগেও তার একটি শাখার সাথে জড়িত মস্তিষ্কের একটি অংশ। তা আকারে মাত্র অর্ধ ইঞ্চি হলেও স্নায়বিক কোষসমূহের এমন কিছু অংশ সমন্বিত, যা জোড়ায়-জোড়ায় নিজেদের মধ্যবর্তী লাইনের দুই দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। আরও অধিক গবেষণা জানাচ্ছে যে, বিভিন্ন জীব-জন্তুর মধ্যে খাওয়ার অসীম লিপ্সা 'হাইপোথ্যালামাস'-এর স্নায়বিক কোষসমূহের একটা বিশেষ জুড়ি 'ভেন্ট্রামেডিয়াল'-এর ক্ষতি সাধিত হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অন্যান্য স্নায়বিক জুড়িসমূহের ক্ষতি সাধনে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এ কথাও জানা আছে যে, ভেন্টোমেডিয়াল' জুড়িকে নষ্ট করে দিলে স্বভাব চরিত্রে বর্বরতা, হিংস্রতা ও বদমেজাজিরও উদ্ভব হয়। এ-ও জানা গেছে যে, আর একটি জুড়িতে ক্ষতি সাধন করা হলে জন্তুগুলো খাদ্যগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে এবং অভুক্ত থাকার ফলে মৃত্যুর নিকটে পৌঁছা সত্ত্বেও খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে। এইভাবে খাদ্য লিপ্সা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ বোর্ড আবিষ্কৃত হলো।

'মস্তিষ্কের বহিঃস্তরের নীচেই 'টেমপোর‍্যাল লোব'-এর শীর্ষস্থানের নিকটস্থ স্নায়বিক কোষসমূহের অপর একটি গুচ্ছ রয়েছে, যাকে Amygdala বলা হয়, তাকে নষ্ট করলেও খাদ্যস্পৃহার অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা যায়। 'এ্যামিগডালা' একটি Limbic system-এর অংশ। তা হাইপোথ্যালামাস-এর সাথে কয়েকটি সূত্রে গ্রথিত। এমিগডালার কতিপয় স্নায়বিক কোষ খাদ্য-ইচ্ছাকে উদ্দীপিত করে। আর অপর কিছু স্নায়বিক কোষ এই খাদ্যসমূহকে বন্ধ করে দেয়। এ্যমিগডালা অন্যান্য আবেগ ইচ্ছার তৃষ্ণা ও

তৃপ্তিকেও নিয়ন্ত্রিত করে, হাইপোথ্যালামাস্, যৌন ইচ্ছাকে উদ্দীপিত করার জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রমাণিত হয়েছে যে, 'হাইপোথ্যালামাস্'-এর একাংশের ক্ষতি সাধিত হলে মানুষ যৌন উদ্দীপনা থেকে বঞ্চিত হয়ে সর্বপ্রকারের যৌন ইচ্ছা থেকেই মুক্ত হয়ে যায়। মানুষের যৌন-অংশ যখন পূর্ণ পরিপক্কতা লাভ করে, তখন তা যৌন হরমন সৃষ্টি করতে থাকে। এই হরমন রক্তে মিশে যায়। পরে 'হাইপোথ্যালামাস-এ পৌঁছে যৌন উদ্দীপনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'হাইপোথ্যালামাস'ও যৌন স্পৃহার পারস্পরিক সম্পর্ক অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত করা হয়েছে। 'এ্যামিগডালা'রও যৌন স্পৃহার সাথে তেমনি সম্পর্ক বিদ্যমান, যেমন খাদ্যস্পৃহার সাথে 'হাইপোথ্যালামাস'-এর অপর অংশগুলোকে উত্তেজিত করা হলে ভয় ও ক্রোধের আবেগ প্রকাশিত হয়। 'এ্যামিগডালারও' এমনিই অবস্থা। সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, 'হাইপোথ্যালামাস' ও এ্যমিগডালা ভিত্তিক আবেগমুখর কার্যকারণ সমূহের এমন একটা সিস্টেম রয়েছে যা মস্তিষ্কের ক্রিয়া ব্যবস্থার খুবই নিকটে উপস্থিত এবং যাতে প্রভাবিত হয়ে মানুষ আবেগময় হয়ে বাহ্যিক কার্যকারণের প্রতিরোধ করে। ভাবাবেগসম্পন্ন কার্যকারণের এই সিস্টেমকে এক সময়ে একই উদ্দীপক আবেগ কার্যনিরত রাখতে সক্ষম। হাইপোথ্যালামাসের স্নায়বিক কোষ বিভিন্ন আবেগকেন্দ্রসমূহ দাবীদার আবেগসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি আবেগকে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মের জন্যে বাছাই করে নেয়। এই আবেগকেন্দ্রসমূহ দেহের প্রয়োজন ও পরিতৃপ্তির নতুনতর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থেকে পরস্পরে ঠিক করে নেয় কোন্ আবেগের প্রকাশমানতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এটাও বিবেচ্য হয় যে, এক্ষণে কোন্ দাবিটির সর্বাধিক মাত্রায় প্রয়োজন। আর কোন্ লক্ষ্যটি অর্জনযোগ্য ? পৃ. ২৩৭-২৫২

শরীরবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ভাবাবেগ পর্যবেক্ষণের স্মৃতি এবং মনের চেতন-অবচেতনের নিগূঢ় তত্ত্ব কি, তা স্পষ্ট করে তোলার জন্যে উপরের উদ্ধৃতিসমূহ যথেষ্ট। হৃদয়াবেগ ব্যক্তিগত স্থিতিস্থাপকতা ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে প্রকৃতি প্রদত্ত এক হাতিয়ার বিশেষ। তা মানবদেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মাংসগ্রন্থীর রাসায়নিক কার্যক্রমের দরুন সৃষ্ট হয়। আর এসব রাসায়নিক কার্যক্রমের উদ্দীপক হচ্ছে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ

'হাইপোথ্যালামাস' ও 'এ্যমিগডালা' যা বহিঃপরিবেশের দাবি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্নায়ুতন্ত্রীকে রাসায়নিক কার্যক্রমের সাহায্যে উদ্দীপিত ও উদ্বুদ্ধ করে এবং উৎপন্ন রাসায়নিক পদার্থসমূহ রক্তের সাথে মিশ্রিত হয়ে আবেগময় তৎপরতা ও চাঞ্চল্যের উদ্ভব করে। পরিবেশ যদি শত্রুর সঙ্গে শক্তিপরীক্ষার দাবিদার হয়, তাহলে সাহস, হিংমত ও ক্রোধের আবেগের সাথে আনুপাতিক রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টিকারী মাংসগ্রন্থীগুলোকে সক্রিয় বানিয়ে দেয়া হয়। আর পরিবেশ যদি প্রেম-ভালবাসা ও আত্মনিবেদনের দাবিদার হয়, তাহলে প্রেম-ভালবাসা আবেগসৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থের মাংসতন্ত্রীসমূহ সক্রিয় হতে শুরু করে। পক্ষান্তরে পরিবেশ যৌন কামনা-লালসার দাবিদার হলে যৌন আবেগ উত্তেজনাকারী মাংসতন্ত্রীসমূহ সক্রিয় বানানো হয়— আর কোনরূপ দলীল প্রমাণ ছাড়াই এ সত্য স্বীকৃতব্য যে, আবেগ সমূহকে উচ্ছ্বসিত উদ্দীপিতকারী সমগ্র পরিবেশ অবশ্যই সংজ্ঞানমুখর-ই হতে পারে, নির্জ্ঞান বা অবচেতন আদৌ নয়। আবেগসমূহ উদ্দীপিত হওয়া ও কর্মরত থেকে পরে উত্তেজনামুক্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণত সচেতন ও সংজ্ঞান কার্যক্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

এ কথাও স্পষ্ট যে, কোন আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতার স্মৃতি অন্যান্য অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণাদির স্মৃতির অনুরূপই হয়ে থাকে— মনে সর্বপ্রকার স্মৃতির স্থিতিস্বরূপ এক ও অভিন্ন।

পর্যবেক্ষণ ও আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতাসমূহের স্মৃতি মনের পটে নিষ্প্রাণ প্রতীকী চিহ্ন বিশেষ। তা স্বীয় বিশেষ কোড্ বা সংকেতিক ভাষা মুখে মনের পটে বর্ণমালায় লিখিত গ্রন্থের মতো। তা স্বতঃই প্রেরণাদায়ক হয় না, তা প্রেরণা পেয়ে সক্রিয় হয়। মানব-মনে চেতনার লক্ষ্যকেন্দ্র যখন-ই এবং যেসব স্মৃতির লেখনকে আয়ত্তাধীন করে নেয়, তা চেতনায় ভাস্বর ও প্রতিভাত হয়ে ওঠে। অন্যথায় তা সমাধিস্থ হয়ে পড়ে থাকে। আবেগ ও মুক্ত স্মৃতিসমূহ তো কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণের চেতন বা সজ্ঞানের পুনরাবৃত্তি করে, কিন্তু আবেগপূর্ণ স্মৃতিসমূহ যেহেতু আবেগপূর্ণ পটভূমিতে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে, এই কারণে বারবার আবেগময় অবস্থা সৃষ্টি করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উপরোক্ত প্রমাণিত তত্ত্বসমূহের প্রেক্ষিতে ভাবাবেগ 'অবচেতনায়' সবসময় প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে। অথচ সে সম্পর্কে আমরা সচেতনভাবে অনবহিত থেকে যাই— ফ্রয়েডের এই মতটি সর্ব দিক দিয়েই ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। ভাবাবেগ আসলে সাময়িক পরিবেশের সৃষ্টি। তার কোন স্থিতি বা স্থায়িত্বই থাকতে পারে না। তা নিজের কাজ সম্পন্ন করে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায়। তার উৎপত্তিস্থল মস্তিষ্ক নয়। তা মাংসগ্রন্থী, কোষ বা স্নায়ুতন্ত্রীসমূহের রাসায়নিক কার্যক্রমের ফলে জেগে ওঠে, দেহের বিভিন্ন অংশে অস্থায়ীভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু সময় ধরে স্বীয় শক্তির প্রদর্শন করে নিঃশেষ হয়ে যায়। মস্তিষ্কের কোন চেতন কিংবা অবচেতন নির্জ্ঞান অংশে তার কোন আশ্রয়-কেন্দ্র নেই। কেবলমাত্র স্মৃতিলোকে লুকিয়ে ঘুমিয়ে থাকা স্মৃতিসমূহ অন্যান্য পর্যবেক্ষণাদির মতোই থেকে যায়। কিন্তু তা না কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার যোগ্যতা রাখে, না তা কিছু করে। এভাবে সব কয়টি ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব প্রাসাদটির বালুস্তুপের মতোই ধ্বসে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পরিণতিই লাভ করতে পারে না।

শিশুর যৌনস্পৃহা— ঈডিপাস কমপ্লেক্স

এখানে আমরা ফ্রয়েডের 'শিশুর যৌনস্পৃহা— ঈডিপাস কমপ্লেক্স' পর্যায়েও আমাদের বক্তব্য পেশ করতে চাই।

ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান তত্ত্বের সহজ বৃত্তি সম্বন্ধে তার মতামতের গভীর যোগাযোগ। তিনি মনে করেন, মানুষ জন্মাবার মুহূর্তেই কতকগুলো সহজ বৃত্তি নিয়ে জন্মায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি এই পর্যায়ে যৌনবৃত্তি, জিঘাংসাবৃত্তি ইত্যাদি রকমারি সহজ বৃত্তির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে যৌনস্পৃহা চরিতার্থ করার কামনা বা আবেগ একক আবেগ হিসেবে মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হওয়ার সময়ই ভ্রূণের প্রকৃতির মধ্যে আসন গেড়ে নেয়। শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকেই তা প্রকাশ পেতে শুরু করে। এছাড়া অন্যান্য সমস্ত বৃত্তিই এই একক গৃহজাত বৃত্তি থেকেই উৎসারিত হয়। কিন্তু সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। স্নায়ুতন্ত্রী পর্যায়ে বিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্ব এই মতকে নিতান্ত মূর্খতা বই আর

কিছুই মনে করতে পারে না। জীববিদ্যার যে-কোন ছাত্র জানেন যে, বিভিন্ন বৃত্তি বা আবেগ বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্রীর আলাদা আলাদা রাসায়নিক পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে এবং যৌনবৃত্তি উদ্দীপক স্নায়ুতন্ত্রীসমূহ অন্য কোন বৃত্তি বা আবেগ উদ্দীপিত করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। উপরন্তু যৌনবৃত্তির উদ্দীপনা যৌবন প্রাপ্তির পূর্বে কখনই সৃষ্টি হতে পারে না।

বৃত্তি ও আবেগসমূহের উৎস ও সেসবের কর্মপদ্ধতি বা প্রক্রিয়া পর্যায়ে প্রমাণিত হয়েছে যে ঃ

১. কতিপয় বিশেষ মাংসগ্রন্থির রাসায়নিক কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট বিশেষ রাসায়নিক পদার্থসমূহের রক্তপ্রবাহের সাথে সংমিশ্রিত হলে মানবদেহের বিশেষ অংশে বিশেষ ধরনের চাঞ্চল্যকর অবস্থা সৃষ্টির নামই ভাবাবেগ বা বৃত্তি। ইচ্ছা-লিপ্সা স্পৃহা, প্রেম-ভালবাসা, ভয়, ক্রোধ ও যৌন কামনা প্রভৃতি রকমারি ভাবাবেগের জন্যে আলাদা আলাদা নানা স্নায়ুতন্ত্রী সুনির্দিষ্ট। তা নিজের নিজের রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন করে। যৌনস্পৃহা সৃষ্টিকারী স্নায়ুতন্ত্রী অন্যান্য আবেগ সৃষ্টিকারী স্নায়ুতন্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ ও সর্বোতভাবে স্বতন্ত্র।

২. এই আবেগ স্বতঃই ও প্রয়োজন বিহনে সৃষ্টি হয় না। তা কোন-না-কোন বহিঃ পরিবেশের কিংবা আভ্যন্তরীন দাবি বা প্রেরণার চাপেই উদ্ভুত হয়ে থাকে।

৩. মানুষের মস্তিষ্কই হচ্ছে এসব ভাবাবেগ সৃষ্টির নির্দেশদাতার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। তা বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার দরুন সংশ্লিষ্ট স্নায়ূতন্ত্রীসমূহকে রাসায়নিক কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দেয়।

৪. ভাবাবেগের কোন স্থায়িত্ব নেই। তা সাময়িকভাবে উদ্ভুত হয় এবং স্বীয় কর্তব্য পালন করে নিঃশেষ হয়ে যায়। বিশেষ ধরনের উত্তেজনাকর অবস্থা আবেগের সূচনায় সৃষ্ট হয় এবং আবেগ নিঃশেষ হয়ে গেলে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তখন মানুষ তার স্বাভাবিক সুস্থ ও প্রশান্তিপূর্ণ অবস্থায় ফিরে আসে।

৫. অন্যান্য সকল প্রকার আবেগ সংশ্লিষ্ট মাংসগ্রন্থী ও স্নায়ুতন্ত্রী শিশুর জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণত্ব পায়, তারপর হতেই তা কাজের যোগ্য হয়ে

যায়। কিন্তু যৌনস্পৃহা সংশ্লিষ্ট মাংসগ্রন্থিসমূহ শিশুর জন্মকালে অসম্পূর্ণ থাকে। দশ-বারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর সেগুলোর কার্যক্রম হওয়ার যোগ্যতা আসে। পূর্ণবয়স্কতা বা যৌবন লাভের পূর্বে কোন শিশু যৌন আবেগ প্রকাশের যোগ্যই হয় না। কোন শিশু সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মতৎপরতা দেখালেও তা বড়দের সংস্পর্শে শিখে নেয়া বাহ্যিক তৎপরতার নকলনবিশি মাত্র। তা আবেগের প্রকাশ বলে মনেই করা যেতে পারে না।

এসব প্রমাণিত ও অকাট্য তত্ত্বের আলোকে 'যৌন আবেগই একক মৌল ও সহজাত বৃত্তি,' ফ্রয়েড়ের এই মতের ভ্রান্তি ও ভিত্তিহীনতা ভাস্বর হয়ে ওঠে। অপরাপর আবেগ যৌনস্পৃহার আবেগ থেকেই যদি উৎসারিত হতো, তাহলে যৌন আবেগের রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টিকারী মাংসগ্রন্থিসমূহ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়ে সেই রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করতে শুরু না করে দেয়া পর্যন্ত— পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্তি না হওয়ার পর্যন্ত— মানুষ অন্য কোন আবেগ প্রকাশেরই যোগ্য হতে পারত না। কিন্তু পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা থেকে প্রমানিত হয়েছে যে, জন্মের পর অবিলম্বেই যৌন-স্পৃহার আবেগ ছাড়া শিশুর অন্যান্য সমস্ত আবেগেরই প্রকাশ ঘটতে থাকে। কাজেই যৌনস্পৃহার আবেগ-উদ্দীপনা অপর কোন আবেগের ফলশ্রুতি বলে দাবি করা হলে তা অবশ্যই বিবেচ্য হতে পারত। কেননা তা অন্যান্য সমস্ত আবেগের বহু পরে প্রকাশ পেতে শুরু করে। কিন্তু যৌন স্পৃহাই অন্যান্য সমস্ত আবেগ জন্ম দিয়েছে বলে দাবি করা হলে 'মার পূর্বেই সন্তানের জন্ম হয়েছে' বলার মতোই অর্থহীন ও হাস্যকর বিবেচিত হতে বাধ্য। কিন্তু মাংসগ্রন্থিও কোন স্নায়ুতন্ত্রী সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যৌন-স্পৃহা উদ্দীপক মাংসগ্রন্থি ও স্নায়ুতন্ত্রীসমূহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য স্পৃহা সৃষ্টিকারী আবেগের উদ্দীপক মাংসগ্রন্থি ও স্নায়ুতন্ত্রী সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এ দুয়ের মাঝে বাপ-সন্তানের সম্পর্ক বলতে কিছুই নেই।

শিশুদের গতিবিধি তৎপরতা যারাই গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করেছেন তারা ভালভাবে জানেন, পাঁচ-ছয় বছরের নিষ্পাপ শিশুর যৌন স্পৃহায় আবেগ-উদ্দীপিত হওয়া তো দূরের কথা, পিতা-মাতাকে যৌন-সঙ্গমে লিপ্ত দেখতে পেয়েও কি হচ্ছে তা তারা অনুধাবন করতেও অক্ষম। পিতা-মাতার সঙ্গমকালীন নড়াচড়া দেখে তাদের মধ্যে বিস্ময়বোধ

জাগতে পারে; কিন্তু অনুরূপ যৌন-স্পৃহা জেগে ওঠা সম্ভব নয়, তার অধিক অপর কোন অনুভূতি উদ্দীপিত হয়ে ওঠার কথাও সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় ব্যাপার। কিন্তু ফ্রয়েড এবং ফ্রয়েডপন্থীদের হঠকারিতায় বাধ্য হয়ে মনস্তত্ত্ববিদগণ এই স্পষ্ট সত্য তত্ত্বের বিস্তারিত অধ্যয়ন করেছেন। তাঁরা বহুসংখ্যক অল্প বয়স্ক বালক ও বালিকাদের দীর্ঘদিন পর্যন্ত অধ্যয়ন অধীন রেখে সাক্ষ্য প্রমাণ সহকারে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণ করেছেন ঃ 'শিশুর যৌন-স্পৃহা' ভিত্তিহীন কল্পনাবিলাস ছাড়া কিছুই নয়। আর 'ঈডিপাস কমপ্লেক্স' একটা মনগড়া কল্প কাহিনী মাত্র। অল্প বয়স্ক শিশুর মধ্যে কোন যৌনস্পৃহার আবেগ কখনই জেগে ওঠে না, হতেও পারে না। তার কোন চেতনাই তার মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া মেয়ে শিশুর তুলনায় পুরুষ শিশুর মা'র প্রতি কিংবা পুরুষ শিশুর তুলনায় মেয়ে শিশুর পিতার প্রতি বিশেষ ও অধিক কোন আকর্ষণ থাকে বলে মনে করা নিছক হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মেয়ে ও মা-তে এবং পুত্র ও পিতা-তে কোন বিদ্বেষ বা জিঘাংসাবৃত্তিরও কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। শিশুরা বরং তার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য শিশুদের প্রতিই বিদ্বেষী হয়ে থাকে, পিতা বা মা'র প্রতি কখনই নয়।

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডাঃ C. W. Valentine তাঁর The Normal Child and Some of His Abnormalities গ্রন্থে শিশু-মনস্তত্ত্ব পর্যায়ে অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার ফলাফল উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ফ্রয়েডের মতাদর্শ, শিশুর যৌনস্পৃহা, মাতা-পুত্র ও পিতা-কন্যার পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক প্রভৃতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে জন্ম থেকে ছয় বৎসর বয়স পর্যন্তকার কয়েকশ' শিশুকে সার্বক্ষণিকভাবে অধ্যয়নে রেখে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর এই জটিল ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যৌন স্পৃহা বলতে কোন কিছুর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই বয়সে তারা যৌনস্পৃহা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও রিক্ত থাকে। অপর দিকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের নিষ্পাপ আকর্ষণ কতটা থাকে নিম্নোদ্ধৃত তালিকা দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এ থেকে জানা যায়, মার প্রতি পুত্র কন্যার আকর্ষণ সমান ও অভিন্নহারে থাকে। পিতার প্রতি পুত্রের যেমন ঘৃণা-বিদ্বেষ কিছুই থাকে না, মার প্রতিও থাকে না কন্যার কোনরূপ হিংসার ভাব।

শিশুর বয়স	পিতার প্রতি পুত্রের টান	পিতার প্রতি কন্যার টান	মার প্রতি পুত্রের টান	মার প্রতি কন্যার টান
২ বৎসর	শতকরা ১১ ভাগ	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৭৭ ভাগ	শতকরা ৮৭ ভাগ
৩ বৎসর	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ২৮ ভাগ	শতকরা ৬১ ভাগ	শতকরা ৬৬ ভাগ
৪ বৎসর	শতকরা ৩৮ ভাগ	শতকরা ৩৬ ভাগ	শতকরা ৫৭ ভাগ	শতকরা ৬৬ ভাগ
৫ বৎসর	শতকরা ২৮ ভাগ	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৫৭ ভাগ	শতকরা ৬৬ ভাগ
৬ বৎসর	শতকরা ২৩ ভাগ	শতকরা ১৫ ভাগ	শতকরা ৬৮ ভাগ	শতকরা ৭৮ ভাগ

সন্তান ও পিতা-মাতার পারস্পারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবধারা থাকে বলে কোন খবর পাওয়া যায়নি। যেখানে কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবধারা লক্ষ্য করা গেছে তা অন্যান্য শিশুদের প্রতি, পিতা কিংবা মার প্রতি নয়। (উক্ত গ্রন্থ পৃ. ১০৮)

উপরোক্ত গবেষণা একথা স্পষ্ট করে দেয় যে, মেয়ে শিশু কিংবা ছেলে শিশু উভয়ই কম বয়সে মার প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করে। আর এই বয়সে মার প্রতি সন্তানের এই আকর্ষণ খুবই স্বাভাবিক। পরে বয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার প্রতি আকর্ষণের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মার প্রতি সে আকর্ষণের মাত্রাহ্রাস পেয়ে যায়।

পিতা-পুত্র এবং মা-কন্যার পারস্পরিক আকর্ষণ প্রায় সমান মাত্রায়ই থাকে। মা-ছেলে ও মা-মেয়ের পারস্পরিক আকর্ষণও অনুরূপ মাত্রায়ই লক্ষ্য করা গেছে। শিশুর লিঙ্গ ও পিতা-মাতার লিঙ্গের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না।

অধ্যাপক জ্যোস্ট্রো লিখেছেন ঃ

> ফ্রয়েডের সমস্ত রচনার স্তুপ 'ঈডিপাস কমপ্লেক্স' যেমন রূচিহীন তেমনি অপরিমেয়। এর কোনখান থেকে 'ঈডিপাস কমপ্লেক্স' ধরনের মতবাদ কি করে দানা বাঁধল, তা জানা যায় না। বারেবারে পুনরাবৃত্তি করে পাঠ করা সত্ত্বেও শুধু এতটুকুই জানা গেছে যে, এটা শুধু মনস্তাত্ত্বিক বিশেষণে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

Dr. Ramus ফ্রয়েডের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও লিখেছেন, মা-সন্তানের পারস্পরিক আন্তরিক ও একনিষ্ঠ সম্পর্ককে 'যৌন স্পৃহার আবেগ' নামে অভিহিত করা— জেনে-শুনেই করা হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে— সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং ইচ্ছামূলক ব্যাপার। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে কেউ-ই প্রথমবার এই চিন্তা মনে স্থান দিয়েছে, তাকে প্রথমেই মাতা-পুত্রের মধ্যকার অবৈধ সম্পর্কের মতাদর্শ রচনা করে নিতে হয়েছে। পরে সেটিকে কোন খুঁটির সাথে ঝুলানোর জন্যে 'ঈডিপাস কমপ্লেক্সের' কল্প-কাহিনী এই মনে করে রচনা করেছে যে, সেটি তার উদ্দেশ্যের খুবই নিকটবর্তী (১৯৮ পৃ.) জীব-বিজ্ঞান, শরীর-বিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের কোথাও এই অস্বাভাবিক সম্পর্কের একবিন্দু বৈধতা আমি খুঁজে পাই না। বরং এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন সব সর্বসমর্থিত মৌলনীতির অবস্থিতি দেখতে পাই, যা এই ধরনের সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব গণ্য করে। সেসব ভিত্তিহীন চিন্তা ভাবনায় পাওয়া আলাদা কথা, যাতে ছেলে-পিলেরা আকাশ-কুসুম কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকে, কিংবা যাতে ফ্রয়েডের অনুসারীরা অ-যথার্থতার করিৎকর্মা হয়ে নিমগ্ন হয়।' Freud, His Dream and Sex Theories, P— 203)

শিশুদের ক্রমবৃদ্ধি ও শিশুদের মনস্তত্ত্ব পর্যায়ে আমেরিকার প্রখ্যাত The Gesell institute of Child Development জন্ম থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্তকার বালকদের আচরণ, ব্যবহার ও গতিবিধি তৎপরতা পর্যায় Child Behaviour নামে একখানি বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থের দশম অধ্যায় 'যৌন আচরণ ও যৌন আকর্ষণ আগ্রহ' একাদশ অধ্যায় হচ্ছে মা-সন্তানের সম্পর্ক এবং দ্বাদশ অধ্যায় হচ্ছে পিতা-সন্তানদের পারস্পরিক সম্পর্ক, এই তিনটি অধ্যায় চল্লিশ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত। কিন্তু তার কোথায়ও 'শিশুর যৌনস্পৃহা' মা'র সাথে অবৈধ সম্পর্ক কিংবা পিতা-পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিন্দু পরিমাণ উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফ্রয়েডের এসব জঘন্য ও উদ্ভট চিন্তা-কল্পনাকে ভ্রূক্ষেপ-অযোগ্য বস্তাপচা ও প্রত্যাখ্যাত মনে করে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়া হয়েছে।

ফ্রয়েডের বিবাচক বিভাগ (Censor)-ও বালুকার স্তরের ওপর গড়ে তোলা হয়েছিল। তার যুক্তি বিন্যাস ছিল এই ঃ

ক. মানুষের মনোলোকের অবচেতনায় (Sub-conscious) একটা বিবাচক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যা মানুষের ভাবাবেগের স্বাভাবিক স্রোতের ওপর সভ্যতা ও সংস্কৃতির কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে থাকে।

খ. ভাবাবেগের স্বাভাবিক প্রকাশ মানবতার ওপর এই অস্বাভাবিক ধারা বন্ধন ভাবাবেগকে জোরপূর্বক দাবিয়ে অবচেতনে সমাধিস্থ করে দেয়।

গ. কিন্তু অবচেতনের উদ্দীপিত ও উদ্বেলিত ভাবাবেগসমূহ বিবেক-বুদ্ধি ও সভ্যতার বাধ্যবাধকতার চাপে ক্রমাগত ও প্রতিনিয়ত আলোড়ন সৃষ্টি করতে থাকে এবং কখনও কখনও বহুরূপী বেশ ধারণ করে বিবাচকের চোখে ধুলি দিয়ে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যেতে সমর্থ হয়।

ঘ. অবচেতনের ভাবাবেগ ও বিবাচকের এই দ্বন্দ্ব মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার উদ্ভব করে। আর এভাবে নৈতিকতা ও অধ্যাত্মবাদের উপদেশ-নসীহত স্বাভাবিক ভাবাবেগকে অস্বাভাবিকভাবে দাবিয়ে দমিয়ে দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক জঠিলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই চার পর্যায়ের 'লজিকে' শুধু এতটুকু কথাই যথার্থ যে, বিবেক বুদ্ধি ও সভ্যতা সংস্কৃতির দাবি এবং মানবীয় ভাবাবেগের স্বাধীনমুক্ত প্রকাশমানতার মধ্যে সংঘর্ষজনিত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তা বাস্তবে হবেই, এমন কথা বলা যায় না। আর এসব অবস্থা অবচেতনভাবে হয় এমন কথাও সত্য নয়। ভাবাবেগের প্রকাশমানতা বিবেক-বুদ্ধির দাবি ও সংঘর্ষের সম্ভাব্যতা— এ তিনটিও সচেতন অবস্থা। তার কোন একটির জন্যেই অবচেতন বা অনবচেতনের স্তর নির্দিষ্ট করা সম্পূর্ণ অবাস্তব। মানব মন এক অভিভাজ্য একক। মানুষের ভাবাবেগ কি দাবি করছে, তা তার নিকট কিছুমাত্র অ-স্বচ্ছ বা প্রচ্ছন্ন নয়। তার বিবেক-বুদ্ধি কি বলছে তাও নয় তার অজানা। অতএব এই উভয় দাবির মধ্যে চেতন অবচেতনের সংঘর্ষের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। মানুষ পূর্ণ সচেতনভাবেই সমগ্র পরিবেশের অনুভূতি লাভ করে থাকে। সে ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রিত করবে না তার অনুসরণ করবে ও তাকে উন্মুক্ত করে ছেড়ে দেবে, সে বিষয়ে তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ভাবাবেগকে রাশমুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত করা হলে বিবেক-বুদ্ধির দাবিকে অগ্রাহ্য করতে হবে। তাই বলে সেখানে সংঘর্ষ কিছুই ঘটে না। ভাবাবেগ

তার লেখা দেখাতে থাকে। আর তাতে ফ্রয়েডের পক্ষে মনস্তাত্ত্বিক কোন জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয় না।

পক্ষান্তরে ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত করা হলে মস্তিষ্ক এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রকে সংশ্লিষ্ট মাংসগ্রন্থি ও স্নায়ুতন্ত্রীসমূহকে অধিকতর রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি থেকে নিরস্ত ও নিবৃত্ত রাখার নির্দেশ দেয়। হাইপোথ্যালামাস ও এ্যমাগডালার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট মাংসগ্রন্থি ও স্নায়ুতন্ত্রীগুলোকে অধিক উত্তেজক পদার্থ সৃষ্টি থেকে নিবৃত্ত করে দেয়। তখন ভাবাবেগের প্রকাশ ও সক্রিয়তা নির্বীর্যতা লাভ করে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায় আর শেষে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়। না বিবেকবুদ্ধি ও ভাবাবেগের মধ্যে কোন সংঘর্ষ বাধে, না ভাবাবেগকে কোন অবচেতনের দিকে ঠেলে নিয়ে দাবিয়ে দেয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে। আসল কথা হচ্ছে, কোন ভাবাবেগেরই স্থিতি নেই, কাজেই তার কোথায়ও নিয়ে স্থিত বা সমাধিস্থ হওয়ার বা জবরদস্তিতা করারও কোন কথা বলা যায় না। মস্তিষ্ক ভাবাবেগের আশ্রয়স্থল নয়, মস্তিষ্কে চেতন ও অবচেতনের বিভাগ বলতেও কিছু নেই, যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে, গোটা ব্যাপারটাই মনগড়া ও উদ্ভট ও ভিত্তিহীন।

ভাবাবেগের অবচেতনে বসে বিবেক বুদ্ধির পাহারাদারের চোখে ধুলি দেয়া ও বহুরূপী আকার আকৃতি ধারণ করা একটা অযৌক্তিক কল্পগাঁথা তো হতে পারে, কোন বিদগ্ধের বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিশ্চয়ই বলা যায় না। সহজাত বৃত্তির মতোই এই চিন্তাটা একই কলেবলে দুটি ধুরন্ধর ও শঠ মনের অবস্থিতি মেনে নিতে মানুষকে বাধ্য করে। অথচ তা নয়, ফ্রয়েড বলছেন, আর নয় তা কোন সত্য ও বাস্তবতা।

মোটকথা সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব সমাজ জীবনে মানবীয় আচরণে এমন সব নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেছে যা ভাবাবেগের অপ্রতিহত প্রবাহকে রুখে দাঁড়ায় এবং তাকে বিশেষ প্রক্রিয়া মেনে চলতে বাধ্য করতে চায়, এই কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ-ও সত্য যে, এসব নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যবাধকতা সবই সচেতনভাবে হয়, আর চেতনেই হয় তার সমস্ত কার্যক্রম। তার প্রতিক্রিয়াও সচেতনই হতে পারে। কোন অবচেতন তো দূরের কথা সচেতন সংঘর্ষেরও কোন অবকাশ এখানে নেই। কেননা

সংঘর্ষের সম্ভাব্যতার পূর্বেই ব্যক্তি স্বতঃই সিদ্ধান্ত করে, সে বিবেক-বুদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেবে, না ভাবাবেগকে। অতএব নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উপদেশ স্বাভাবিক ভাবাবেগকে অস্বাভাবিকভাবে দাবিয়ে দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার উদ্ভব করে বলে মনে করাই বিভ্রান্তিকর। কোন ভাল বা মন্দ মতাদর্শের শিক্ষণ কোন মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার উদ্ভব করে না। এটাতো একটা চিন্তা বা মতের প্রচার মাত্র। কেউ কোন নৈতিক মতাদর্শ গ্রহণ করলে ও তদনুযায়ী কাজ করলে, তার অর্থ এ-ই নয় যে, সে এই নৈতিক মতাদর্শটিকে স্বীয় বিবেক-বুদ্ধির অনুকূল ও তার সাথে সামঞ্জস্যশীল পাচ্ছে। আর সে যখন স্বীয় ভাবাবেগ ও বিবেক-বুদ্ধির দাবির মাঝে কোন অগ্রাধিকার দানের সিদ্ধান্ত করে তখন তা সে নিজের মতেই করে। সে ভাবাবেগকে রুখতে চাইলে সংশ্লিষ্ট মাংসগ্রন্থি ও স্নায়ুতন্ত্রীসমূহকে তদনুরূপ নির্দেশ দেয় এবং তার রাসায়নিক কার্যক্রমকে বন্ধ করে ভাবাবেগকে বিলীন করে দেয়ার ব্যবস্থা করে। ভাবাবেগ বন্ধ ও কয়েদ করার মতো কোন অবস্থারই সৃষ্টি হয় না। কোন মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ইন্ধন জমা হতেও দেখা যায় না। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টির প্রকৃত কার্যকারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর।

অথচ ফ্রয়েড নিতান্ত মুর্খতাবশতঃই ভাবাবেগ বন্ধ ও কয়েদ করাকে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টির কারণ বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু আসল অবস্থার সঙ্গে তার কোন সঙ্গতি নেই। মহান স্রষ্টা জন্মগতভাবেই প্রত্যেকটি মানব দেহে এমন ব্যবস্থাপনা কার্যকর করেছেন, যার দরুন ভাবাবেগের অন্যান্য প্রতিবন্ধের কোন সুযোগই আসে না। পরিবেশের বাধ্যতা কিংবা ব্যক্তির নিজের লৌহদৃঢ় সংকল্পও যদি ভাবাবেগকে শ্বাসরুদ্ধকর মাত্রায় দাবিয়ে দিতে চায়, তাহলে Escape Values বা 'বহিঃগমন কপাট' স্বাভাবিক ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে কার্যকর ও তৎপর হয়ে ওঠে। তখন ভাবাবেগের সমস্ত পুঞ্জীভূত রাসায়নিক পদার্থ প্রবাহিত হয়ে বের হয়ে যায়। ভাবাবেগ নিশ্চল ও নির্যীর্য হয়ে পড়ে। মানুষ প্রশান্তি লাভ করে। নৈতিকতা আধ্যাত্মিকতাপন্থী অবিবাহিত যুবকদের যৌন স্পৃহার আবেগ যখন প্রতিবন্ধের চাপে শ্বাস-রুদ্ধকর অবস্থা অনুভব করে, তখন 'স্বপ্ন-দোষের' মাধ্যমে শুক্রকীটের নিষ্ক্রমণে অনেকটা প্রশান্তি পেয়ে যায়। তীব্র প্রচন্ড ক্রোধাবস্থায় যুধ্যমান

ব্যক্তি যখন অধিকতর শক্তিশালীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে, তখন তার ক্রোধের তীব্রতা প্রচন্ডতা প্রথমে দুঃখ ও হতাশার রূপ পরিগ্রহ করে। তারপর অবারিত ধারায় প্রবাহিত ঈষদোষ্ণ অশ্রুপ্রবাহ তাকে এই দুঃখ ও হতাশা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে দেয়। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ মানুষ যখন দুঃখ-হতাশার তীব্রতায় নিজের এই দুঃখ হতাশার ভাবাবেগকে দমন করতে চায়, তখন তার ঠুনকো আবেগ-বিধুর হাতিয়ারসমূহকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বেহুশ হওয়াই তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে। সারকথা, প্রতিটি ভাবাবেগের জন্যে কোন-না-কোন 'নির্গমন গবাক্ষ' স্বাভাবিকভাবেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। তার ফলে ভাবাবেগ অসাধারণ প্রতিবন্ধের চাপে পড়ে কোন কঠিন রোগ বা দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এটা একটা অতীব স্বাভাবিক অবস্থা। আর এ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, ভাবাবেগের প্রতিবন্ধকতা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কারণ হয় না কখনও। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কারণ অন্য কিছু , অন্যত্র অবস্থিত।

মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা

মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টির কারণ কি ? অভিজ্ঞতামূলক মনোবিজ্ঞানের প্রবণতা যখন দেখা দিল, তখন-ই তা জানবার জন্যে চেষ্টার সূচনা হলো। মানুষ ও জন্তুর আচরণের ওপর গভীর সূক্ষ্ম পরীক্ষণ চলতে শুরু করল। প্রশিক্ষণ ও আচরণের (Behaviour and Learning) নিকট সম্পর্কের গুরুত্ব বিবেচনা করা হলো। বাইওকেমিকে মানবীয় ব্যক্তিত্বের মৌল উপাদান মনে করে প্রশিক্ষণমূলক পরিবেশকেই ব্যক্তিত্ব গঠনের কারিগর বা নির্মাতা ঘোষণা করা হলো। মানুষ পর্যবেক্ষণ ও ভাবাবেগের অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েই জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মের দিন থেকেই সে পরিবেশের সাথে যুধ্যমান হয়ে যায়। তার কাঁচা বুদ্ধি তার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাসমূহের কোন-না-কোন ব্যাখ্যা করে নেয়। এই ব্যাখ্যায় আরও বেশি লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে সংশোধন ও বৃদ্ধি সাধিত হতে থাকে। যোগ্যতার ভাবাবেগ, পর্যাবেক্ষণ ও পরিবেশের মধ্যে প্রতিদিনকার প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে একটি 'কর্মপন্থার' ভিত্তি স্থাপন করে। শিশু তার বিশেষ ধরনের

আবেগ বিধুর কর্মপন্থা ও কাল্পনিক চিন্তা-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে থাকে। ভাবাবেগ চিন্তাধারার সমন্বয় সাধনের এই বিশেষ পদ্ধতি প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই নিজস্ব হয়ে থাকে। আর এই কর্মপন্থা-ই তার ব্যক্তিত্বের ভিত্তিপ্রস্তর।

যে শিশুকে ছোট বয়স থেকে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে ক্রমাগতভাবে যুঝতে হয় এবং পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের পক্ষ থেকে সে কোনরূপ উৎসাহ বা সাহায্য সহযোগিতা না পায়, সে স্বাভাবিকভাবেই ভয় মিশ্রিত নৈরাশ্য, হতাশা ও ব্যর্থতার কারণে সংশয়, খারাপ ধারণা ও অপ্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক চিন্তায় নিমগ্ন হবে। এই ধরনের ভাবনা-চিন্তাই তার সমস্ত অবসর মুহূর্তগুলো আচ্ছন্ন করে রাখবে। এসব চিন্তা-ভাবনার প্রভাবে সে নৈরাশ্যজনক চিন্তা ও কর্মে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। নৈরাশ্য হবে তার ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছিন্ন অংশ। এর সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে লালিত-পালিত শিশু আশাবাদী প্রকৃতির অধিকারী হবে। সে নির্ভয়, আশাবাদী, দুঃখ-দৈন্য ও প্রতিবন্ধকতার সাথে শক্তি পরীক্ষার জন্যে সব সময় প্রস্তুত, দুঃসাহসী, বীরত্বসম্পন্ন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারী হয়ে গড়ে ওঠবে। কর্মের পুনরাবৃত্তিতে অভ্যাস ও প্রবণতার সৃষ্টি হয়। পরিবেশে যে ধরন ও পদ্ধতির কর্মের যত বেশি পুনরাবৃত্তি ঘটবে, স্বভাব-প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের ঝোঁক সেদিকে ততই বৃদ্ধি পাবে।

ব্যক্তিত্ব গঠনে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। সে দৃষ্টিতে এটা বুঝতে পারা যায় যে, শিশু যতই বড় হতে থাকবে, ভাবাবেগের অগ্রহণযোগ্য প্রকাশমানতাকে নিয়ন্ত্রিত করা কেন প্রয়োজন এবং কিভাবে তা করা সম্ভব, তা সে ক্রমশ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। সে তার চিন্তা ও আবেগের পন্থায় চেষ্টা করেই সংশোধনী আনতে শুরু করে। তার এবং সংশোধনমূলক চেষ্টা-প্রচেষ্টা সফল ও সুফলদায়কও হয়। শিশু মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ লোকদের পর্যবেক্ষণাধীন তো বৈপ্লবিক পরিবর্তনও আনা যেতে পারে। কেননা কর্মের পুনরাবৃত্তির পরিণতিতে যে অভ্যাস গড়ে ওঠে তা সৃষ্টি-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা পরিবর্তনযোগ্য। কার্যত অনেক অবস্থায়ই তা পরিবর্তিত হয়েও যায়।

মানসিক প্রশিক্ষণের দৃষ্টিতে অসঙ্গতিপূর্ণ পরিবেশে লালিত হয়ে যারা বড় হয়েছে, তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে অনেক ত্রুটি থেকে যায়। জীবনের দ্বন্দ্বে ও

সংগ্রামে এসব লোক যখন সমাজের অন্যান্য লোকদের সাথে মুকাবিলায় আসবে, তখন এসব ত্রুটি তাদের ছোটত্ব বোধে (Inferiority complex) নিমজ্জিত করবে। এই ধরনের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্য থেকে কোন বিশেষ ত্রুটি যদি অস্বাভাবিকভাবে প্রকট হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার ধারক এই কারণে মনস্তাত্ত্বিক জঠিলতায় পড়ে যায়।

এরূপ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হচ্ছে এই দোষযুক্ত ও ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিই পরিহার করা এবং অধিক সুস্থ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির অভ্যাস করা। কাজটা আদৌ সহজ নয়। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের এটাই একমাত্র পথ। ফ্রয়েডীয় চিন্তায় চিন্তা ও কর্মের এই বদ অভ্যাসের পূর্বের অভিজ্ঞতাকে এ জন্য দায়ী করা হয়েছে এবং সেই বিশেষ অভিজ্ঞতার বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে সন্ধান করে রোগীর সম্মুখে সমুপস্থিত করে দেয়াই তার একমাত্র চিকিৎসা। চিকিৎসকের এই রোগ নির্ণয় পদ্ধতিতে বিশ্বাসী রোগীকে পূর্বাভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করানোও তাকেই রোগের মূল কারণ এবং তাকে বের করে দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করানোর ফলে কিছুটা নিরাময়তা বোধ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু তা যে নিতান্তই অস্থায়ী ও ক্ষণিকই হবে তাতে সন্দেহ নেই। ফ্রয়েডের সমস্ত রোগীই যে এই অস্থায়ী ও ক্ষণিক রোগ উপশম বোধ করত তা জোর করেই বলা যায়। কিন্তু এ পদ্ধতিতে কেউই সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়নি। তা হতেও পারে না। রোগটা আসলেই চিন্তা ও কর্মের একটা ভ্রান্ত পন্থার পরিণতি। তাই তা আবার ফিরে আসত। কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয় কিংবা শেষ যে কোন অভিজ্ঞতা রোগের জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী নয়। সব কিছুর সার্বিক প্রভাব যে 'বিশেষ কর্মপন্থা' প্রবর্তন করেছে, তা-ই সেজন্য দায়ী। কাজেই এই কর্মপন্থার পরিবর্তনই তার একমাত্র চিকিৎসা।

ইসলাম দেড় হাজার বছর পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছে, যে অভ্যাস প্রকৃতিগত বা মজ্জাগত নয়, তা-ই পরিবর্তনযোগ্য। কর্মের পুনরাবৃত্তির সাহায্যে কর্ম ও চিন্তাপদ্ধতিতে পরিবর্তন সূচিত করে ইসলামী ভাবধারার প্রতিমূর্তি নবতর ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা-ই ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের চরম ও পরম লক্ষ্য। ইসলামী ইবাদাত সংক্রান্ত সমস্ত আদেশ উপদেশ এবং ইসলামী

কর্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম আহ্‌কাম এই উদ্দেশ্যেই বিধিবদ্ধ। সুস্থ, নির্ভুল চিন্তা-বিশ্বাস ও কর্মের মুসলমান লাখো রকমের দৈহিক রোগে আক্রান্ত হলেও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় কখনই পড়বে না, এই কথা সর্বপ্রকার সোবাহ সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

স্বপ্ন দর্শন

স্বপ্ন কি ? কি তার নিগুঢ় সত্যতা ও বাস্তবতা ? মনের কামনা-বাসনার প্রতিফলন-ই কি স্বপ্নের কারণ ? মনোবিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁরা এখনও যথার্থভাবেই স্বপ্নের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। শুধু কয়েক ধরনের স্বপ্নের বিশেষ কারণসমূহ অভিজ্ঞতার আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু বহু প্রকারের স্বপ্নই এখনও ব্যাখ্যার অপেক্ষায়। তাদের মতে মনের কামনা-বাসনাকে স্বপ্নের কারণ ও উদ্দীপক মনে করা ঠিক নয়। 'বিড়ালের স্বপ্ন শিকা-ছেঁড়া' কথাটি ফ্রয়েডেরও বহু শতাব্দী পূর্বে থেকে একটি রসিকতারূপে জনসমাজে সাধারণভাবেই প্রচলিত। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা শিকা ছেঁড়ার সত্যতা প্রমাণিত করেনি।

Dr. H. J. Eysenck লিখেছেন ঃ

> 'স্বপ্ন মনস্কামনা চরিতার্থতার প্রতিফলন ঘটায়'— ফ্রয়েডের এই প্রকল্প প্রমাণ করতে চায় যে, অভিযাত্রী ও অন্যান্য লোকেরা যখন নিজেদের কঠিন অভিযাত্রায় বিপদাপন্ন হয়ে নিজেদের তাঁবুর মধ্যে পড়ে থেকে অনশন অর্ধাশনে ছটফট করতে থাকে তখন তারা খাদ্য সম্ভারের স্বপ্নই দেখতে পাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করে। এভাবে খাদ্য প্রয়োজন খাদ্যের কামনা সৃষ্টি করে, আর স্বপ্ন যেহেতু কামনা পরিপূরণের জন্য সদা প্রস্তুত, তাই তা তখন ভুনা করা গোশ্‌তের বড় বড় থালা ও ছড়া-বরির কেক্ তাদের সমুখে পেশ করে। কিন্তু ফ্রয়েড এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণ আমাদের সমুখে পেশ করেন নি, সাধারণ বিশ্বাস-অযোগ্য ধরনের বর্ণনাদিই উপস্থাপিত করেছেন মাত্র, যা গ্রহণ অযোগ্য অনির্বাচিত ও অসম্পূর্ণ। সৌভাগ্যবশত এক্ষণে আমাদের সামনে এমন সব আধুনিক অভিজ্ঞতাসমূহের বর্ণনা মওজুদ রয়েছে, যা উপযুক্ত পরিবেশ ও বিশেষ পর্যবেক্ষণের অধীন তৈরী করা হয়েছে। আর যাতে অংশগ্রহণকারী

ব্যক্তিদের অভুক্ত থাকার কারণে এক চতুর্থাংশ ওজন কম হয়ে গিয়েছিল। তাদের স্বপ্নের বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষিত হয়েছে। আর তাদের বিপরীতে উচ্চমানের লোকদের (Control group) স্বপ্নের রেকর্ডও রাখা হয়েছে, যাদের প্রয়োজনীয় খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। উভয় রেকর্ডের তুলনা একথা প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম যে, অভুক্তরা পেট ভরে খাওয়া লোকদের তুলনায় খাবারের স্বপ্ন অধিক দেখেছিল। এরূপ অভিজ্ঞতামূলক— পন্থা প্রমাণ করেছে যে, ফ্রয়েডের প্রতিবেদনমূলক প্রমাণ অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন। আর স্বপ্নের স্বরূপ ও তার উদ্দেশ্য পর্যায়ে ফ্রয়েডের মূল চিন্তা-ই ভুল। (Use and Abuses of Psychology, p— 231 - 232)

'স্বপ্ন প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার ফসল'— এ অত্যন্ত প্রাচীন মত এবং অনেকটা সত্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, উচ্ছৃংখল চিন্তাই সমস্ত স্বপ্নের মৌল কারণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, মানবেহিতাসের এ সত্য চির অম্লান ও সংরক্ষিত যে, বহু লোক এমন দেখা গেছে, যাঁরা স্বপ্নের ঘোরে অতি উচ্চমানের কাব্য ও সাহিত্যকর্মের দৃষ্টান্ত সংস্থাপন করেছেন; বহু আবিষ্কারের কেন্দ্রীয় চিন্তাবিন্দু এই স্বপ্নের ঘোরেই লাভ করেছেন। ভবিষ্যতে সঙ্ঘটিতব্য ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে স্বপ্নযোগেই জানতে পেরেছেন। এসব থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্বপ্ন কেবলমাত্র উচ্ছৃংখল ও অসংলগ্ন চিন্তারই ফসল নয়। তাতে গভীর চিন্তা-গবেষণারও একাগ্রতা (Concentration) লক্ষ্য করা যায়। সৃষ্টিধর্মী যোগ্যতা প্রতিভার বিকাশ এবং গায়েবী জ্ঞানের উদ্ঘাটনও সম্ভবপর এই স্বপ্ন থেকেই।

বস্তুবাদী লোকেরা যেহেতু বস্তু অতীত কার্যকারণকে সম্ভাব্য হিসাবেও গণ্য করতে প্রস্তুত নয়, এই কারণে তারা অধ্যাত্মবাদীদের পর্যবেক্ষণ ও গায়েবী জ্ঞানের উদ্ঘাটনকে বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব দেয় না। তাদের কথায়ও যে কোন সত্য নিহিত থাকতে পারে, এ বিষয়ে একবিন্দু চিন্তা করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব যেন। এই কারণে 'স্বপ্নের কিছু কারণ' যেমন মনের গহণে অবস্থিত, তেমনি কিছু কারণ বস্তু-অন্তরালের ওধারেও অবস্থিত— এরূপ কথা বস্তুবাদীদের নিকট অর্থহীন। কেননা তাদের চোখের ওপর বিদ্বেষের ঠুসি চাপা রয়েছে। তাদের কাল্পনিক জগতের বাইরে অবস্থিত কোন মহাসত্যও

চোখ তুলে দেখতে তারা সম্পূর্ণ নারাজ। বস্তুত স্বপ্নের জগত বিশাল বিস্তীর্ণ। স্বপ্ন জগতের ওপর উচ্ছৃংখল অসংলগ্ন চিন্তার এবং কল্পনাবিলাসের প্রতিপত্তি যেমন রয়েছে, তেমনি বিবেক-বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম চিন্তার আধিপত্যও তথায় কম থাকে না। ভাবাবেগ ও প্রেম-ভালবাসার প্রদর্শনীও তথায় কম হয় না। ভূ-স্বর্গের দৃশ্যাবালীও সেখানে যেমন লোভনীয় মোহনীয় হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি কবর ও দোযখের আযাব ও কথাও স্বপ্নদ্রষ্টাকে কাঁপিয়ে কাঁদিয়ে দেয়। মনের আবেগ বিধুর জটিলতাও তথায় কাজ করে, রূহের উচ্চ মার্গে উড্ডয়নশীলতা, উচ্চতর পবিত্র লোকের সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তা ও মহা সত্যের সাথে সাক্ষাৎকারও তথায় নেহাত বিরল নয়। এ এক বিশাল জগত, তার বিশালতা এখানে আলোচ্য নয়। মোটামুটি বলা যায়, 'বিড়ালের ভাগ্যে শিকা-ছেড়াই' স্বপ্ন সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা নয়। আর তাতেই নয় তা সীমাবদ্ধ। তার চাইতেও অনেক ব্যাপক হচ্ছে এই জগতটি।

অধ্যাপক জ্যোস্ট্রো ফ্রয়েডের জীবদ্দশাতেই এ সিদ্ধান্ত শুনিয়েছিলেন ঃ ফ্রয়েডের চিন্তা-ভাবনা ভিত্তিহীন কল্পনাবিলাসের ওপর ভিত্তিশীল। তা থেকে গৃহীত ফলাফল বহু সংখ্যক উপায়ে লব্ধ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ সত্যও তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ফ্রয়েডের যুক্তি-বিজ্ঞান প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে চলেছে, তাকে বিকৃত করেছে এবং লাগামহীন উচ্ছৃংখল চিন্তা-ভাবনার সাহায্যে প্রথম পর্যায়েই বোধগম্য কথাবার্তাকে ভিত্তি করে অত্যন্ত সারহীন ফলাফল বের করে (১৭২ পৃ.)। ফ্রয়েডের রচিত প্রাসাদ বালুর স্তুপের ওপর নির্মিত। তাতে চুন-সুর্কীও লাগানো হয়েছে খুবই দুর্বল মানের। যারা মনস্তত্ত্বকে একটা অসংলগ্ন তথ্য সমষ্টির পর্যায় থেকে উর্ধ্বে তুলে বিজ্ঞানের সংরক্ষিত উচ্চতর মর্যাদায় আসীন করেছেন, তাঁদের বক্তব্য হলো, ফ্রয়েডের মনগড়া কল্প-কাহিনী, উদ্ভট কিস্সা-উপাখ্যান ও ভিত্তিহীন চিন্তা-কল্পনার কোন স্থান মনোবিজ্ঞানে নেই। ফ্রয়েডের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ যে হট্টগোল ও চিল্লা-চিল্লির সৃষ্টি করেছে তা থামলেই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের আন্দোলন এক মিথ্যা দাবিকারী ও অপহরণকারীরূপে চিহ্নিত হয়েই নির্বাসিত হয়ে যেতে বাধ্য হবে। তার নাম-চিহ্ন কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য হয়, তাহলে খুব শীগ্‌গীরই ফ্রয়েডের দর্শন

'বিজ্ঞান যুগের একটি উজ্জ্বল বিভ্রান্তি' নামে অভিহিত হবে— জ্ঞান-বিজ্ঞানজনিত মহা ব্যস্ততার মধ্যে আধুনিক যুগের এক মহা মরীচিকা।

Freud, His Dream and Sex Theories, P— 277

উত্তরকালের মনোবিজ্ঞান বিশারদগণ এই কথাকে সত্যায়িত করেছেন। বলেছেন, 'জোস্ট্রোর' এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য এবং বাস্তবানুগ। প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ DR. H. J. Eysenk তাঁর Uses and Abuses of Psychology গ্রন্থে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দোষ-ত্রুটি পর্যায়ে একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় দাঁড় করে উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক আলোচনা পেশ করার পর এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন ঃ

> যদিও তার মমি বানানো লাশের প্রদর্শনী ভক্তদেরকে এখনও করানো হচ্ছে; কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, মানব প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দাবিদার মনঃসমীক্ষণ বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নিজ শক্তির বলে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যবস্থা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুবরণ করেছে।' (P. ২৩২)

একালের জ্ঞান-বিজ্ঞান জগত মনস্তাত্ত্বিক মতবাদসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। মানব মনকে যৌন লালসার প্রচণ্ড প্রতিমূর্তি বলে চিহ্নিত করার মত এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। 'শিশুর যৌন স্পৃহা' এক্ষণে কারুর নিকটই গ্রহণীয় নয়। 'ইডিপাস' পুনরায় গল্প-কাহিনীর নায়ক সেজেছে এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বেশির ভাগ মৌলনীতিই ভুল ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। ফ্রয়েডের এখানো বেঁচে থাকা অনুসারী ও শিষ্য সাগরিদদের সনদহীন টোট্কা চিকিৎসকের অধিক কোন মর্যাদা বা গুরুত্ব নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে মূর্খতা ও আল্লাহ্দ্রোহিতার এই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যা পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর গভীর রেখাপাত করেছে। পাশ্চাত্যবাদীদের আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিক মূল্যমান ও ভাবাদর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে ফ্রয়েড কোন বিকল্প গঠনমূলক মতাদর্শ উপস্থাপনে সক্ষম হয়নি। লালসা প্রবৃত্তির যে ক্ষণভংগুর খেলনা তিনি পেশ করেছিলেন, তা বিবেকমান চিন্তাশীল বিদগ্ধদের খুব বেশিক্ষণ প্রলোভিত করে রাখতে পারেনি। ডারউইন ও ফ্রয়েডের প্রতি নিরাশ হয়ে জীবন ও মনস্তত্ত্বের জটিল রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে প্রাথমিক কালের পিপাসাদীর্ণ হৃদয় অনুসন্ধানের সীমাহীন মরুপ্রান্তরে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরছে।

একমাত্র ইসলামী দর্শনই তাদের ও নির্বিশেষে সমস্ত নির্ভুল সত্যের সঙ্গে পরিচিত এবং সর্বপ্রকার বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম, অন্য কিছু নয়। এই কথা আজ মধ্যাহ্নকালীন মেঘমুক্ত মার্তন্ডের মতই চিরভাস্কর, কোন জ্ঞানী-বিজ্ঞানীই তা অস্বীকার করতে পারে না।[১]

১. প্রবন্ধটি ইসলামী ফাউণ্ডেশন পত্রিকার ১৯৭৯ সনের জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মার্কসীয় দর্শন

মার্কস ও মার্কসীয় দর্শন

কার্লমার্কস উনবিংশ শতকের (১৮১৮-১৮৮৩) একজন মস্তবড় দার্শনিক চিন্তানায়ক। বর্তমান দুনিয়ার চিন্তাদর্শন, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রদর্শনের ওপর তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। কিছুটা সচেতনভাবে আর কিছুটা অচেতনভাবে আজকের মানুষ তার চিন্তাদর্শনে প্রভাবান্বিত। মার্কস মানবজীবনের প্রায় সর্ব দিক সম্পর্কে দার্শনিক তত্ত্বমূলক ও বাস্তব কর্ম সম্পর্কিত চিন্তাধারা পেশ করেছেন। তার এই চিন্তাধারার সমষ্টিরই নাম হলো মার্কসবাদ এবং তার দর্শনকেই বলা হয় মার্কসীয় দর্শন। কার্লমার্কস তার সমস্ত দার্শনিক মতবাদ গড়ে তুলেছেন— তার পূর্ববর্তী দার্শনিক চিন্তাবিদদের চিন্তাধারা ও মতবাদকে ভিত্তি করে। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছেন— উপাদান গ্রহণ করেছেন G. W. E. হেগেলের চিন্তা ও মতবাদ থেকে। এক কথায় বলা চলে, হেগেলের কাছ থেকে মূল প্রেরণা নিয়েই মার্কস তার নিজের দর্শন গড়ে তুলেছেন। মার্কসের ওপর অপর কোন দার্শনিকের কোন প্রভাব পড়েনি, একথা বলা হচ্ছে না। তার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে হেগেলীয় দর্শনের— এটাই বক্তব্য, অতএব মার্কসীয় দর্শনের আগে হেগেলীয় দর্শনের আলোচনা আবশ্যক।

ডায়ালেকটিক বাদ

হেগেলের দর্শনকে এক কথায় বলা যায় ঃ Philosophy of opposites 'বিপরীত জিনিসসমূহের দর্শন'। মানবীয় চিন্তা-গবেষণার শুরু থেকেই একথা সর্ববাদী সমর্থিত যে, প্রতিটি জিনিসই তার বিপরীত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক অস্তিত্বের জন্যে অস্তিত্বহীনতা, স্থিতির জন্যে ধ্বংস

অবধারিত। দুঃখ-কষ্টই যদি না হলো তবে আনন্দ ও সন্তোষের ফুল কখনো প্রস্ফুটিত হতে পারে না। ক্লান্তি না আসলে বিশ্রাম কিসের ? যেখানের ফুল ফুটেছে, তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঁটা। এই সবই স্বাভাবিক ব্যাপার, সকলেরই জানা কথা এ— সকলেই এর সত্যতা অনুভব করতে পারে।

কিন্তু এর ভিত্তিতে স্বতন্ত্র ও সয়ংসম্পূর্ণ এক চিন্তা পদ্ধতি গড়ে তোলা, সে এক সম্পূর্ণ ভিন্নকাজ। দার্শনিক হেগেল এ সত্যকেই এক ব্যাপক ও পরিপূর্ণ দর্শন হিসেবে পেশ করেছেন। এর ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন এক নবতর দার্শনিক মত। ফলে ধারণা ও চিন্তা-কল্পনার ক্ষেত্রে এ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের কর্মজীবনের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এর এক সিদ্ধান্তমূলক প্রভাব পড়েছে। হেগেল বলেছেন ঃ প্রতিটি জিনিস তার বিপরীত জিনিসের দ্বারা কেবল কায়েমই নয়, দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত যা কিছু উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে মানবতা যতটুকু অগ্রসর হতে পেয়েছে, তার সব কিছুরই মূল কারণ হচ্ছে পরস্পর বিপরীত জিনিসগুলোর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। প্রত্যেকটি ধারণা বা বিশ্বাস যখন একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যায়, তখনি তার মাঝ থেকে তার বিপরীত ধারণার সৃষ্টি হয় এবং দুটোর পারস্পরিক দ্বন্দের ফলে এক নবতর ধারণা বা বিশ্বাস অস্তিত্ব লাভ করে। অন্য কথায় বলা যায়, মানুষ যখন কোন ধারণা সম্পর্কে পূর্ণ চিন্তা ও গবেষণা করে এবং 'লজিকের' দিক দিয়ে তাকে পূর্ণ পরিণত করে নেয়, তখনি এমন এক অবস্থা সম্মুখে আসে, যখন সে অনুভব করে যে, যে ধারণা থেকে সে যাত্রা শুরু করেছিল তা এখন আর বর্তমান নেই। সেখানে এমন এক নতুন ধারণা এসে স্থান দখল করেছে, যা পূর্বের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। হেগেল এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এই ভাবে যে, গরীবদের সাহায্য করা, দান-খয়রাত করা সকল সামর্থ্যবান ব্যক্তিরই কর্তব্য। একথাটি সাধারণ নৈতিক শিক্ষা হিসেবে সব ধর্মেই স্বীকৃত। এখন যদি এ কথানুযায়ী সকলেই দান-খয়রাত উদার হস্তে করতে থাকে, তাহলে সেখানে গরীব থাকবে না। এতে করে গরীবকে সাহায্য দেয়া কর্তব্য— এ ধারণাটি নিজেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যখন গরীবই কেউ থাকবে না, তখন আর তাদের সাহায্য করার কেনা কাজই থাকতে পারে না।

মায়ের স্নেহ সন্তানের জন্যে অপরিহার্য। এ নাহলে সন্তানের ব্যক্তিত্ব ও জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু মা যদি সন্তানকে স্নেহ করতে গিয়ে তার যেকোন আবদার মেনে নেয়, তাহলে সন্তানের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবার সম্ভাবনা। ফলে মায়ের স্নেহ এক সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে ভয়ের উদ্রেক হতে থাকে। অর্থাৎ নিজেই চরম পর্যায়ে পৌঁছে তার বিপরীত ভয় সৃষ্টি করবে। হেগেলের মতে এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রতিটি ধারণাই সীমাবদ্ধ— অসম্পূর্ণ। এ কারণেই তা থেকে তার বিপরীত জিনিসের সৃষ্টি হয়। তার ফলে প্রথমটির অস্তিত্ব মুছে যায়। এর পরে নতুন ধারণার সৃষ্টি; তা পূর্বতন ধারণার সবগুলো দিককেই বাতিল করে না, বাতিল করে তার দুর্বল ও অসম্পূর্ণ দিকগুলোকে। তার পরে যেহেতু বাতিলকৃত ধারণার সম্পর্কেই পরবর্তী ধারণা নির্দিষ্ট হয়, এই জন্যে তাতে পরবর্তী ধারণার স্মৃতি জাগ্রত থেকে যায়। আর এটি হয় পূর্বতন ধারণার তুলনায় অধিক প্রশস্ত। এই কারণে বিপরীতধর্মী ধারণাসমূহের সংযোজনায় এক নবতর Unit সৃষ্টি হয়, যা পূর্বের ধারণা দুটো অপেক্ষা অনেকখানি প্রশস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এই নতুন প্রশস্ততর ধারণাও বাতিল হওয়ার সময় আসে, এই প্রশস্ততর ধারণারও বিপরীত ধারণার জন্ম হয়। আর এরূপ অব্যাহত ভাবেই চলতে থাকে ধারণার পর ধারণা সৃষ্টির কাজ। ক্রমবিকাশের এই কর্মধারাকে হেগেল নাম দিয়েছেন Dialactical process বা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। তার মতে যুগ ও সময়ের ময়দানে এরূপ ভাঙাগড়া অব্যাহত ভাবে চলছে। প্রথমে একটি দাবি সামনে আসে, একে বলা হয় Thesis। তার পরেই তার বিপরীত দাবি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, একে বলা হয় Antithesis। তারপরে এক দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বের পর এ দুইয়ের মাঝখানে এক সমঝোতার সৃষ্টির হয়— অর্থাৎ প্রথম দাবিরও কিছু কথা মেনে নেয়া হয়, পরবর্তী বিপরীত দাবিরও কিছু কথা তার সঙ্গে স্বীকৃত হয়। এই দুইয়ের সংযোজনায় সৃষ্টি হয় তৃতীয় এক দাবি, যাকে বলে Synthesis; পরে এই সিন্থিসিজই একটি দাবি হয়ে দাঁড়ায়। তারপরে তার বিপরীত দাবিও উঠতে থাকে।

হেগেলের মতে এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হচ্ছে এক সর্বাত্মক সামগ্রিক সামাজিক কর্মধারা। ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের গোটা মানবীয় সভ্যতা যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ মানব দেহ— এক জীবন্ত সত্তা। ব্যক্তি ও দলসমূহ যেন

এই দেহের অংশ ও অঙ্গ, হেগেলের মতে এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি থেকে দুনিয়ার কোন কিছুই— কোন নাম করা ব্যক্তিই নিষ্কৃতি পেতে পারে না। এরা যেন সব দাবার গুটি। মানব সভ্যতা ও সমাজের আসল জিনিষ হচ্ছে World reason, World spirit, Absolute spirit.

মার্কসবাদ ও ডায়ালেক্‌টিক্‌বাদ

মার্কসীয় দর্শনের মূল কথা হচ্ছে এই ডায়ালেকটিক পদ্ধতি Dialectic Principles. ডায়ালেকটিক কথাটি গ্রীক দর্শন থেকে গৃহীত, গ্রীক ভাষায় শুরুতে এ শব্দের অর্থ ছিল কথাবার্তা— পরবর্তীকালে বিতর্ক ও আলোচনার এক বিশেষ টেকনিকরূপে পরিচিত হয় ডায়ালেকটিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি চিন্তার দুটোর অংশের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। তার একটিকেও বাদ দিলে এই গোটা পদ্ধতিই অর্থহীন হয়ে যায়। অংশ দুটোর অর্থ হচ্ছে এই যে, সৃষ্টি জগতের মৌলিক ও প্রকৃত সত্য বাইরের জিনিস নয়; বরং চিন্তা ও বিশ্বাসই হচ্ছে মূল। আর দ্বিতীয় এই যে, এই ধারণা-বিশ্বাসগুলো স্থবির ও গতিহীন নয়, বরং প্রবাহমান, গতিশীল, অব্যাহত ধারায় তা বয়ে চলে এবং প্রবাহিত হয়েই ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে যায়। প্লেটোও এ কথা স্বীকার করতেন। তবে পার্থক্য এই যে, প্লেটো চিন্তা ও বিশ্বাসগুলোকে অপরিবর্তনশীল ও নিস্পন্দ বলে মনে করেছেন। এবং বলেছেন যে, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই এগুলো লাভ করা যেতে পারে অর্থাৎ এমন উপায়ে, যাতে বিপরীত চিন্তাকে প্রথমে মেনে নেয়া হবে, তারপরে তার প্রতিবাদ করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত তার মাঝে সামঞ্জস্য ও ঐক্য সৃষ্টি করা হবে।

হেগেল-এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন যে, ধারণা-বিশ্বাসগুলো নিজেরাই এই তিন পর্যায়ের কাজ— অর্থাৎ প্রমাণ, প্রতিবাদ ও সামঞ্জস্য বিধান— সম্পন্ন করছে। অন্য কথায়, নিখিল সৃষ্টিলোকের সমগ্র সত্য মূলত এক ঐকিক ধারণার দ্বন্দ্বমূলক বিতর্কের প্রতিচ্ছায়া। যাতে এই ধারণা তার বিভিন্ন ও বিপরীত দিকসমূহকে প্রকাশ করে এবং কেবল বিশেষ কোন সত্যই নয়, সমগ্র সৃষ্টিলোক এক ব্যাপক ধারণা বিশেষ যা তার বিপরীতগুলোর প্রমাণ করে আর করে তার প্রতিবাদ।

এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে এক উচ্চতর ইউনিট কায়েম করে। এভাবে এই ধারণা ক্রমশঃ স্বীয় অভ্যন্তরকে বিকশিত করে তোলে। বিশ্ব জগতে যে 'খোদায়ী মন' (Divine mind) logical necessity অনুযায়ী ক্রমবিকাশের স্তর অতিক্রম করে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে স্বীয় পূর্ণত্ব বিধান করছে। হেগেলের আবিষ্কৃত চিন্তার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি যেন চিরন্তণ জিনিস— অনন্তকাল থেকেই তা কায়েম রয়েছে। আর কাল ও স্থানের বুকে বস্তুজগত হচ্ছে এই চিন্তা-পদ্ধতির বাহ্যিক অভিব্যক্তি— বহির্বিকাশ।

ফয়েরবাখ মার্কস ও এঙ্গেলস-এর সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তার মতে প্রাকৃতিক জগতে এই নীতি ও পদ্ধতি পূর্ব থেকেই কার্যকর হয়ে আছে, চিন্তা জগতে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে পরে। মার্কস একথাও বলেছেন যে, মানবীয় চিন্তা মূলত বস্তু জগতেই প্রতিষ্ঠিত এবং তা-ই মানব মনের দর্পণে প্রতিফলিত হয় এবং তার ছাচের সঙ্গে মিলে-মিশে যায়। এঙ্গেলসতো হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সম্পর্কে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, মূলত ঃ তা থেকে বস্তুর বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব এবং তার গতির নিয়ম-কানুন প্রকাশিত হয়, চিন্তার নিয়ম-পদ্ধতি তা থেকে উদ্ভাবিত হয় গৌণতঃ। তার দাবি হচ্ছে ঃ হেগেল চিন্তা জগতের জন্য যে পদ্ধতি রচনা করেছেন, তা বস্তুর অবস্থা ও বাস্তব ঘটনাবলীর ওপরও প্রযোজ্য হতে পারে। তা সমাজ বিজ্ঞানই হোক আর সামাজিক জীবন যাপন সম্পর্কিত জ্ঞানই হোক। অথবা তা জীব-বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানই হোক কিংবা তা জীব-বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান আর ভূগোল-বিজ্ঞানই হোকনা কেন।

মার্ক্সবাদ ও বস্তুবাদ

মার্কসবাদের দাবি হচ্ছে এই যে, মানবীয় মন (Human mind) বস্তুর উদ্ভাবিত— এর বিপরীত নয়। হেগেলীয় দর্শনে ধারণা ও চিন্তা, বিশ্বাসকে বিশ্ব জাহানের মৌলিক সত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর সম্পূর্ণ বিপরীত মার্কসীয় মতবাদ হচ্ছে ঃ প্রকৃত ও মৌলিক সত্তা কেবল বস্তুরই রয়েছে। মানুষের মন, তার চেতনা, তার ধারণা-বিশ্বাস সব কিছুই প্রকৃত পক্ষে বস্তুর উদ্ভাবন মাত্র। Engelse বলেছেন ঃ "matter is not a

product of mind but mind itself is merely the highest product of matter. লেনিন লিখেছেন ঃ natural science positively asserts that the earth once existed in a state in which woman or any other living creative existed or could have existed ..... Hence matters primery, and mind, consciousness, sensation are product of a very high development.

মার্কসবাদের দৃষ্টিতে প্রকৃতি বা বস্তু চিরন্তন, মন ও চেতনা গৌণ। বস্তুই জীবনের রূপ পরিগ্রহ করছে। জীবন থেকেই চেতনা জেগেছে এবং এ চেতনা থেকেই মনের সত্তা গড়ে উঠেছে। মার্কস এজন্য প্রমাণ হিসেবে ভূ-বিজ্ঞানের Geology নবতর আবিষ্কারের কথা পেশ করেছেন। বলেছেন ঃ এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, গোটা ভূমণ্ডল মানুষের পূর্বেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। (ফসিল সম্পর্কিত গবেষণা ও আধুনিক আবিষ্কারসমূহ তারা পেশ করেন এর প্রমাণ হিসেবে।)

মার্কসবাদ ও ক্রমবিকাশবাদ (Theory of Evolution)

মার্কসবাদ ডারউইন এবং তাঁর অনুসারীদের রচিত ক্রমবিকাশ থিওরীকে সমর্থন করেছে, সত্য বলে মেনে নিয়েছে। দুনিয়ার ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্যে এই থিওরিকে ব্যবহার করেছে। তবে এতদুভয়ের একটি জায়গায় কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। ডারউইন এবং তাঁর মতাবলম্বী বিজ্ঞানীদের দাবি হচ্ছে ঃ প্রকৃতির বুকে ক্রমবিকাশমান পরিবর্তন সূচিত হয় এবং প্রকৃতির ধারাবাহিকতা কোথাও ব্যাহত হচ্ছে না। প্রকৃতির বুকে কখনও কোন আকস্মিক পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হয় না। মার্কসবাদ একথা স্বীকার করেনি। তার মতে প্রকৃতির ধারাবাহিকতা কখনও কখনও ব্যাহত হতে পারে। কখনও কখনও প্রকৃতির ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পরিহার করে লাফ দিয়ে বহুদূরে এগিয়ে যায় এবং পূর্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপের একটি জিনিসকে সৃষ্টি করে। অর্থাৎ মার্কসীয় দর্শনে ক্রম-বিকাশ (Theory of Evolution) ঐ Emergence Theory-রই অনুরূপ। অর্থাৎ মানবজগৎ ও প্রাকৃতিক জগতে এমন নতুন নতুন গুণ বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়ে পড়ে, যা সম্পূর্ণ অভাবিতপূর্ব। পূর্ববর্তী অবস্থার সঙ্গে এ গুণ বৈশিষ্ট্যগুলোর কি বাহ্যতঃ

কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না ? যেমন দুরকমের রঙ মিলে এক নবতর রঙ সৃষ্টি করে। এ রঙ মৌলিক উপাদানের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। অথবা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মাত্রানুক্রমিক সংমিশ্রণে পানির সৃষ্টি হয়। এই পানিতে তার মৌলিক উপাদান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য ও গুণ থাকে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সম্পর্কে গবেষণা করে একথা কেউ বলতে পারে না যে, এ থেকে পানির মত কোন জিনিস তৈরী হতে পারে। কেননা পানির বৈশিষ্ট্যের সাথে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বৈশিষ্ট্যের কোন মিল নেই। মার্কসবাদে মানবীয় মন ও চেতনার বিশ্লেষণ ঠিক এমনিভাবে হয়ে থাকে। অর্থাৎ দেহের অংশসমূহের সংযোজনে এক উন্নততর জিনিস অস্তিত্ব লাভ করল, যা সম্পূর্ণতঃ নতুন— অভিনব এবং এর মৌলিক উপাদানগুলো সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এ সম্পর্কে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না।

মার্কসীয় দর্শনে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম

(Nature and Natural Laws)

চিন্তা এবং চেতনা সম্পর্কে আলেচনা করতে গিয়ে এঙ্গেলস তাঁর Anti duhring গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'But if the further question is rise. What then are thought and cnsciousness and whence they come it becomes apparent that they are products of the human brain and that man himself is the product of nature. Which has been developed in and along with environment; whence it is self evident that the products of the human brain being in the last analysis also products of nature do not contradict the rest of nature but are in correspondence with it.

এখানে এঙ্গেলস স্বীকার করেছেন যে, মানুষের চিন্তা ও চেতনা সবকিছুই মানুষের মস্তিষ্কের কাজ, আর মানুষ তার গোটা দেহসত্ত্বা ও মস্তিষ্ক সহ স্বয়ং প্রকৃতির উৎপাদন। এবং মানুষের পরিবেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তা অস্তিত্ব

লাভ করেছে। এখানে প্রকৃতিতে বস্তু ও বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতির সমান পর্যায়ে দাঁড় করানো হয়েছে।

মার্কসবাদ কোন উচ্চতর ইচ্ছাশক্তি বা উদ্দেশ্য সম্পন্ন কোন বুদ্ধি বস্তুর ঊর্ধ্বে থাকতে পারে বলে স্বীকার করে না। Historical matterialism গ্রন্থে লেখা রয়েছে ঃ

The entire natural world is governed by law absolautely excludes the intervention of action from outside.

আর এক জায়গায় —

But now a days in our evolutionary conception of the universe there is absolutely no room for either a creator or ruler and to take of a supreme being shut us from the whole existing world implies a contradiction in terms.

লেনিন তাঁর এক চিঠিতে লিখেছেন ঃ 'খোদার সত্তা অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল চিন্তা কল্পনার ফল, প্রাকৃতিক নিয়ম বিধান সম্পর্কে অনবহিতই তা সৃষ্টি করেছে।'

মোট কথা, মার্কসবাদ একটি Purposlve regulating intelligence স্বীকার করে বটে; কিন্তু বস্তুজগতের বাইরে তার অবস্থানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। অর্থাৎ মার্কসবাদ খোদা-বিশ্বাসের কথাটিকে অতটা অস্বীকার করছেনা, যতটা অস্বীকার করছে খোদার সৃষ্টিলোক বহির্ভূত এক সত্তা হওয়ার কথাটিকে। অন্যকথায় মার্কসবাদ বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তিকেই সর্ব শক্তিমান সত্তারূপে মেনে নিচ্ছে ..... মার্কসবাদের খোদা বস্তুর বা জড়ে অন্তর্নিহিত জিনিস, তার বাইরের নয়।

মার্কসবাদ ও নৈতিকতা ঃ (Theory of Morality)

কাল মার্কস লিখেছেন ঃ

The mode of production in material life determines the social political and intellectual life process in general.

অর্থাৎ মার্কসের মতে মানবীয় নৈতিকতা উৎপাদনের ধরণ ও পদ্ধতির দ্বারা নির্ণিত ও বিধিবদ্ধ হয়। অন্যকথায় নৈতিকতার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছার কোন দখল নেই। কেননা মানুষ এ সব কিছুই পূর্ব থেকে তৈয়ার হিসেবে লাভ করেছে। মার্কসের এই নৈতিকতা থিওরির সমর্থনে এঞ্জেলসও কথা বলেছেন। তিনি তার Anti duhring-এ লিখেছেন ঃ

'We maintain on the contrary that all former moral theories are the products in the last analysiss of the economic stage which society had reached at that particular epoch, and as society has hither to moved in class antagonistic morality it has either justified the domination and interests of the ruling class or as soon as oppressed class has become powerfull enough it has represented the revolt against this domination and the future interests of oppressed.

মার্কসবাদ ও ধর্ম

এঞ্জেলস তার Anti duhring গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'All religion however is nothing but the fanatic reflection in mens minds of those external forces which control their daily life, a reflection in which the terrestrial forces assume the form of super natural forces.

অর্থাৎ ধর্মকে মনে করা হচ্ছে শুধুমাত্র বাহ্যিক প্রতিকূল অবস্থাসমূহের প্রতিবিম্ব। এর নিজস্ব কোন যৌক্তিকতা বা মৌলিকতা যেমন নেই, তেমনই নেই এর কোন স্থায়ীত্ব। মার্কসের ভাষায় ধর্ম হচ্ছে 'opium of the people— lenin on religion গ্রন্থের ২১ পৃষ্টায় লেখা আছে 'মার্কসবাদের অপর নাম হচ্ছে বস্তুবাদ'। এজন্যে তা ধর্মের তেমনি দুশমন যতখানি দুশমন অষ্টাদশ শতকের সাধারণ বস্তুবাদ বা ফয়েরবাখের বস্তুবাদ। কিন্তু মার্কস ও এঞ্জেলসের ডায়লেকটিক বস্তুবাদ ফয়েরবাখ ও অষ্টাদশ শতকের অপরাপর বস্তুবাদীদের থেকেও অগ্রসর। এতে বস্তুবাদী দর্শনকে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ব্যবহার করা হয়েছে।

মার্কসবাদ ও চিরস্থায়ী সত্য (Eternal Truths)

মার্কসবাদ কোন চিরস্থায়ী সত্য বিশ্বাস করে না। কেননা মার্কসবাদের দৃষ্টিতে ইতিহাস প্রকৃতির পরিবর্তন-বিবর্তন, ক্রমবিকাশ ও ক্রম উন্নতির অসংখ্য নিদর্শন ও পর্যাবেক্ষণে ভরপুর। এই কারণে এক্ষেত্রে কোন স্থায়ী সত্য স্থান লাভ করতে পারে না। কমিউনিস্ট মেনিফোস্টোতে বলা হয়েছে ঃ Communism repudiets eternal truth and morality instead of refashioning them.' এঙ্গেলস লিখেছেন ঃ মানবীয় চিন্তার নেতৃত্ব ও নিরংকুশতা স্বতন্ত্র ব্যক্তিসমূহের সীমাবদ্ধ ও অনিরংকুশ চিন্তার ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। যে জ্ঞান শর্তহীন অর্থাৎ নিরংকুশ সত্যের ধারক, ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলনের এক সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতার পরই তা ভাল করা যেতে পারে। কিন্তু তা লাভ করার জন্যে মানুষের জীবন সীমাহীন ও অশেষ হওয়া দরকার।

অন্যথায় মানুষ যখন তার এই সীমাবদ্ধ জীবন দ্বারা সীমাহীন সময়ব্যাপী সুদীর্ঘ সাধনা ও ভুল-ভ্রান্তির অভিজ্ঞতার পর সত্য জ্ঞান— চিরস্থায়ী সত্য— লাভ করতে পারে না, তখন আর এখানে চিরস্থায়ী সত্য বলতে কিছু থাকতে পারে না।

মার্কসবাদ ও ওহী

মার্কসবাদের সকল প্রকার জ্ঞানভিত্তিক ধারণা বিশ্বাস লাভের একমাত্র উৎস রূপে গৃহীত হয়েছে মানুষের অভিজ্ঞতা, যা মানুষ লাভ করে বাহ্য জগত থেকে। তাই মানবীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান ব্যতিত অপর কোন জ্ঞান বা ঊর্ধ্বজগতের কোন প্রকৃত জ্ঞানকে সমর্থন করেনা। অধ্যাপক দাসগুপ্ত তার Materialism, marxism Determinism and dialecties নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "জ্ঞানের সমস্ত তথ্য বস্তু জগতের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমরা লাভ করে থাকি। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পারস্পরিক কার্যক্রমের সাহায্যে নবতর চিন্তা ও ধারণা লাভ করতে পারি। আমাদের বাহ্য জগত থেকে লব্ধ জ্ঞানের সাথে তার সম্পর্ক আমরা না-ও জানতে পারি। কিন্তু এই চিন্তা ও ধারণাসমূহের গভীর তলদেশে যদি পৌঁছিতে চেষ্টা করা হয় তাহলে জানা

যাবে যে, আমাদের পূর্বতন অভিজ্ঞতাসমূহের কোন-না-কোন অভিজ্ঞতাই সে অভিজ্ঞতার উৎস। খোদায়ী ওহী খালেছ চিন্তা ও জ্ঞান লাভ করার মাধ্যম হতে পারে না। কেননা এ নিছক কল্পনা ও কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছু নয়"।

ইতিহাসের মার্কসীয় দর্শন ঃ

কার্লমার্কস তাঁর ইতিহাস দর্শন হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে গড়েছেন। হেগেল বলেন, ইতিহাসের ক্রমবিকাশ, ক্রম উন্নতির গতিধারা এবং মানব জীবনের বিপ্লবসমূহ বিপরীত জিনিসসমূহের দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ ফল। জীবনের কোন একটি ব্যবস্থা যখন উন্নতি-উৎকর্ষের চরমতম পর্যায়ে উন্নীত হয়, তখন তারই গর্ভ থেকে কতক বিরোধী শক্তি জন্ম নেয় এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সাথে দ্বন্দ্ব করতে শুরু করে দেয়। শেষ পর্যন্ত এই নবতর শক্তি ও পূর্বতন ব্যবস্থার সংমিশ্রণে এক নতূনতম বাবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে; যাতে পুরানো ব্যবস্থার উত্তম অংশগুলো অবশিষ্ট থেকে যায়— যদিও তাকে অপরাপর অংশ থেকে আলাদা করে দেয়া যায় না। তারপর এই নবতর ব্যবস্থাও যখন একটি পর্যায় বা স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন তারই মধ্য থেকে তার বিপরীত জিনিসের উদ্ভব হয় ও তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এই দ্বন্দ্বের ফলে আবার এক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে পূর্ববর্তী ব্যবস্থা ও তার বিপরীতের সংযোজনায়। পুরানো ব্যবস্থা নির্মূল হয়ে যায়, সেখানে নবতর ব্যবস্থার পর্যায় শুরু হয়। এ ব্যবস্থায় পূর্বতন ব্যবস্থার সার অংশ থেকে যায়। এ ব্যবস্থা পূর্ব ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর প্রশস্ত ও অতিশয় ব্যাপক হয়ে থাকে। এভাবে জীবন হচ্ছে এক নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা। তার প্রত্যেকটি নবতর পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় উন্নত হয় এ দৃষ্টিতে যে, তাতে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের উচ্চতর বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব, তার উত্তম অংশগুলো— যা তার সার নির্যাস— যথারীতি সুরক্ষিত থাকে। মানবীয় ক্রমবিকাশের ধারায় Conservation of values মূল্যবানের সংরক্ষণ মার্কস স্বীকার করেন। এ পর্যন্ত মার্কস হেগেলের সাথে একমত। কিন্তু এর পর উভয়ের পথ চিন্তাধারা আলাদা হয়ে যায়। মার্কস হেগেলীয় "ডাইলেকটিকেল প্রসেজে" এর মূল তত্ত্বটুকু তো লুফে নিয়েছেন; কিন্তু তাকে জীবনের ঘটনাবলীর ওপর এমনভাবে প্রযুক্ত করেছেন যে, হেগেলের

সমগ্র দর্শন প্রাসাদ ধুলিস্মাৎ হয়ে গেছে। তাই হেগেলীয় ডায়ালেকটিক্স্ ও মার্কসীয় ডায়ালেকটিক্স্-এ তফাৎ অনেক। কারণ মার্কস শুধু ডায়ালেকটিসিয়ানই নন, তিনি ডায়ালেকটিক মেটারিয়াল— জড়বাদী, বস্তুবাদী তিনি।

হেগেলের দৃষ্টিতে বিপরীত জিনিসসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংগ্রামের ক্ষেত্র ছিল Realm of ideas 'চিন্তার জগত'। জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। থাকলেও শুধু এতটুকু যে, দ্বন্দ্বের ফলে যে পক্ষ জয়ী হয়, বাইরের গোটা পরিবেশ তারই অধীন হয়ে যায়। ফলে মানুষের সমাজ সভ্যতা, জীবন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের আসল কারণ হচ্ছে চিন্তাজগতের বিপ্লব, যা সৃষ্টি হয় ডায়ালেকটিকবাদ থেকে। এক কথায় হেলেগের মতে মানবেতিহাসের আসল প্রভাবশালী শক্তি হচ্ছে চিন্তা ও বিশ্বাসের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি, স্বয়ং মানুষের নয়। তার জীবন ও তামাদ্দুনের বহিঃপ্রকাশও নয়।

মার্কস হেগেলের এ দর্শনকে উল্টিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মতে ইতিহাসের গতিধারায় উত্থান-পতন ও ভাঙ্গা-গড়ায় আসল জিনিস মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাস নয়, আসল হচ্ছে মানুষের বাস্তব ও বাহ্যিক জীবন— Actual world of human affairs। তাঁর মতে মানবীয় ধারণা-বিশ্বাস হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ অর্থনৈতিক পরিবেশের ফল, এদের নিজস্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন সত্তা নেই। বিপরীতসমূহের দ্বন্দ্ব চিন্তার জগতে বাস করেনা, মানুষের প্রকৃত জীবন ক্ষেত্রেই তা দিনরাত ঘটছে এবং ঘটছে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে— Through change in the economic structure of society। কেননা মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাস জগতের পরিবর্তন আর তো কিছুই নয়, তা হচ্ছে শুধু Reflection of social and economic changes.

মার্কস তার Contribution to the Critique of political Economy গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ The mode of production in material life determine the social political and intellectual life-process— in general— it is not the consciousness of

men that determines their beings but, on the contarary their social being that determines their consciousness.

মার্কসের মতে ইতিহাসের ভিত্তি হচ্ছে বাস্তব। কোন আলৌকিক শক্তির ইঙ্গিত ইতিহাসের গতি নির্দেশ করে না। ইতিহাসের গতি নির্দেশ করে সমাজের Mode of production। তাই তিনি বলেছেন ঃ The conditions governing the relation among men are dependent upon the means of production.

মানুষে মানুষে যে পরস্পর সম্বন্ধ তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে যুগের উৎপাদন প্রথা বা ব্যবস্থার ওপর। তাই When the letter changes, there comes about also a change in the relation among the producers. এ ভাবেই সমাজে উৎপাদকদের মাঝের সম্পর্কও পরিবর্তিত হয় এবং পরিবর্তনের ভিত্তিতেই বিভিন্ন রকমের সমাজ গড়ে ওঠে, সমাজিক জীবন ও সভ্যতার চেহারা রীতিমত বদলে যায়।

আরো পরিষ্কার করে বললেন, মানুষ অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সম্পদ উৎপাদনের সামাজিক প্রচেষ্টায় কর্ম বন্টনের নীতিতে শরীক হয়, সমাজের লোক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে সমাজে Class divisions গড়ে ওঠে; প্রত্যেক শ্রেণীর স্বার্থ অপর শ্রেণীর স্বার্থ থেকে ভিন্নতর হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক উৎপাদনের বণ্টন ব্যবস্থাও কার্যকর হয় শ্রেণী স্বার্থের ভিত্তিতে। এর ফলে সৃষ্টি হয় Property system এবং জনগণের মধ্যে Property relation নির্দিষ্ট হয়। সমাজের আইনও মালিকানা ও শ্রেণী পার্থক্যের সংরক্ষক হয়ে পড়ে। এই সমস্ত আইনগত ও সামাজিক গঠন, এই শ্রেণী পার্থক্য ও মালিকানা ব্যবস্থাকে মার্কসের ভাষায় বলা হয়েছে— Condition of production। মার্কস বলেন ঃ এই উৎপাদন অবস্থা ও উৎপাদক শক্তির মাঝে এক স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রচলিত উৎপাদক শক্তি হয় যে স্তরের, উৎপাদন অবস্থাও সে পর্যন্ত উন্নীত হয়। কিন্তু কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিজের আয়ু পর্যন্ত পূর্ণ করে নিলেই তার মধ্য থেকে নতুন উৎপাদক শক্তির আবির্ভাব ঘটে, যার সাথে উৎপাদন ব্যবস্থা নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে উৎপাদক অবস্থা ও নতুন উৎপাদক শক্তির মাঝে সৃষ্টি হয় সংঘর্ষের। যেমনঃ

১. ভারবহন ও চাষকার্যে যন্ত্রের ব্যবহার, পূর্বে তা ছিল না পরে জানা গেছে। এতে করে প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন সূচিত হলো। আইনও তাকে মেনে নিলো।

২. বাষ্প ব্যবহার ঃ পূর্বে মানুষ জানতো না, পরে জানতে পেরেছে। এতে এক নতুন উৎপাদক শক্তির আবিষ্কার হলো। এ ভাবে নতুন উৎপাদন যন্ত্র instruments of production হাতে পাওয়ার দরুন অর্থনৈতিক সংস্থারও পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থাৎ Form and methods of modes of production বদলে যাওয়ার কারণে পূর্ব থেকে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন প্রথার মাঝে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং এই ডায়ালেকটিক পন্থায়ই পুরানো অর্থ ব্যবস্থা ভেঙ্গে যায় ও নতুন অর্থ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অন্য কথায় পুরাতন সমাজ ভেঙ্গে যায়, নতুন সমাজ গড়ে ওঠে। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা-বিশ্বাস, ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-তামাদ্দুনের প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ চূর্ণ হয়ে যায়। সংক্ষেপে ও মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে মার্কসের অর্থনৈতিক দর্শন। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, এতে একই সঙ্গে তিনটি জিনিস রয়েছে। ঃ ১. ইতিহাস দর্শন, যাকে বলা হয় Material conception of history অথবা Historical materialism ২. শ্রেণী সংগ্রাম এবং ৩. চিন্তা-বিশ্বাস সম্পর্কে মার্কসের মত।

১. মার্কস ইতিহাসের ব্যাখ্যা করেছেন বস্তুবাদী দৃষ্টিতে। তাঁর মতে সামাজিক তথা ঐতিহাসিক অগ্রগতির Determining Factor বা কার্যকারণ সম্বন্ধের যথার্থ বা অনিবার্য কারণ হচ্ছে Economics।

এঞ্জেলস এ কথার প্রতিধ্বনি করে তার বই Anti duhring-এ খোলাখুলি বলেছেন যে, ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা তখনি সম্ভব যখন আমরা মেনে নেবো যে, The production and together with prduction the change of the finished products form the foundation of social order.

অর্থাৎ মার্কসীয় দৃষ্টিতে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করতে হলে Productive force গুলোর মাঝে কি পরিবর্তন হলো আর সঙ্গে সঙ্গে পণ্য দ্রব্যের Social utilities -এর বিনিময় ব্যবস্থাতেই বা কি পরিবর্তন হলো তা দেখতে হবে। সহজ কথায় ঃ

The underlying cause of all social phenomena are to be found not in the philosophy but in the economics of every generation.

অর্থাৎ অর্থনীতিই হচ্ছে সমাজের মূল দর্শন। মার্কস তাই বলেছেন ঃ

I am convinced that the relation among men under the existing laws and the present forms industrial life Express themselves neither in their own nature nor in the development of the human spirit, but that they are deeply rooted in the material conditions of life (that productive forces).

২. শ্রেণী সংগ্রাম Class struggle মার্কসের মতে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন প্রথা ও উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন উৎপাদক শক্তির আবির্ভাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। মালিক পক্ষ চিরন্তন নিয়মে বঞ্চিতদের শোষণ করতে ও তাদের বঞ্চিতই রাখতে চায়। ফলে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই শ্রেণী সংগ্রামের মূল সূত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে Communist menifesto-তে মার্কস এঞ্জেলস লিখেছেন ঃ

Since the establishment of private property society has been divided into two hostile economic classes. Just as in the ancient world the interest of slave owners was opposed it that of the slaves and in medieval europe, the interest of the fendal lords was opposed to that of the serfs. So in our own times the interest of the capitalist class, which drives its income mainly from the ownership of property, antagonistic to the interest of the proletariat class; depends for its livelyhood chiefly upon the sale of it labour power.

তাই মার্কস অন্যত্র বলেছেন ঃ

All social changes has been determind chiefly by the economic class struggles that have pervaded history since the break up of tribal community organisation.

এবং কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর শুরুতেই লিখেছেন ঃ

The histry of hitherto existing socity is the history of class struggles.— মার্কসের মতে এই শ্রেণী সংগ্রামই হচ্ছে সমাজ বিবর্তনের এক অমোঘ হাতিয়ার। সব সময়ই সকল সমাজেই এ সংগ্রাম চলতে থাকবে। অতএব—

Socialism must come. Because historical necessity. The objective of human history, the forces of production are bringing us everyday closer and closer to it.

এই শ্রেণী সংগ্রামের মূলে যে জিনিসটি কাজ করছে, তা হলো Theory of surplus value— বাড়তি মূল্য থিওরী। মার্কসীয় দর্শনের দৃষ্টিতে একটি জিনিসের আসল মূল্য হচ্ছে শ্রম, যে শ্রম দিয়ে তা তৈরী করা হয়েছে, তা তৈরীর ব্যাপারে যে শ্রম বিনিয়োগ করা হয়েছে। মার্কসের পূর্বে আদাম স্মীথ এবং রিকার্ডো এই নীতি রচনা করেছিলেন যে, পূণ্যের বিনিময় মূল্যের আসল মানদণ্ড হচ্ছে শ্রমিক-মজুরদের শ্রম। 'লোক' 'লেবার ক্যান মেইক ভ্যালু' কথাটিকে অমোঘ সত্য মনে করে ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকারের প্রবল সমর্থন দিয়েছেন।

মার্কস তার 'থিওরী অফ ভ্যালু' এদের কাছ থেকেই ধার করেছেন। কিন্তু তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতলব হাছিল করতে চেয়েছেন। তিনি যখন দেখলেন যে, দুনিয়ার অসমর্থ ও অসহায় মজুররা পুঁজিবাদীদের নিরবচ্ছিন্ন জুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে, কেবল প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না, তখন মার্কস এই তত্ত্ব আবিষ্কার করে তাদের সামনে তুলে ধরলেন যে, পণ্যের উৎপাদন কেবলমাত্র তাদের শ্রমেরই ফল, পুঁজিদার কেবল তার সামাজিক মর্যাদা ও জোরের বলে শ্রমিকদের ন্যায্য, সংগত অংশ লুটে নিচ্ছে। এতএব তাদের অধিকার ও ন্যায্য অংশ লাভের জন্য মালিক পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। মার্কস তার থিওরীকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, মনে কর, একজন মজুর দৈনিক একটাকা মজুরীর বিনিময়ে কারখানায় কাজ করছে দৈনিক আট ঘন্টা করে। প্রশ্ন হচ্ছে, সে আট ঘন্টা কাজ করে মাত্র এক টাকা মূল্যে পণ্য

উৎপাদন করে, না তার চেয়ে বেশি করে ? আসলে মজুরীর এ হার এ জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, সে আট ঘন্টা কাজ করে এক টাকা মূল্যের পণ্যই উৎপাদন করে। বরং এ জন্যে যে, সে তার শ্রমের মূল্য আদায় করে নিতে পারে না, কেননা সে দুর্বল ক্ষুধাকাতর— অসহায়। আসলে সে দৈনিক আট ঘন্টা কাজ জরে বেশি— এক টাকার চেয়ে অনেক— বেশি মূল্যের পণ্য উৎপাদন করে থাকে; কিন্তু তার দুর্বলতা, অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে দেয়া হয় মাত্র একটাকা, আর বাকী সবটাই লুটে নেয় পুঁজিদার, কারখানা মালিক, আর এটাই হচ্ছে Surplus value.

৩. চিন্তা, বিশ্বাস, ধারণার পদ্ধতি (Thought process)

পূর্বতন জার্মান দার্শনিকদের মত ছিল যে, মানুষের সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিবর্তনে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী শক্তি হচ্ছে স্বয়ং মানুষের চিন্তা ও ধারণা-বিশ্বাসের শক্তি। আর এ শক্তি তার বাইরের জীবন ও বৈষয়িক প্রয়োজন বাসনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থেকেই কাজ করে। অর্থাৎ ইতিহাসের অগ্রগতির ধারা নির্দিষ্ট হয় নিছক চিন্তা ও ধারণা-বিশ্বাসের শক্তির সাহায্যে— মার্কস এ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তার মতে এই ধারণা, চিন্তা-বিশ্বাসেরও জন্ম হয় মানুষের বাস্তব জীবনের পটভূমিতে ও সমসাময়িক বাহ্যিক পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে। আর তা হচ্ছে তদানীন্তন অর্থব্যবস্থা।

মার্কসীয় দর্শনে রাষ্ট্র (Theory of state)

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় দর্শনের দৃষ্টি হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Private property) থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি। সমাজে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রচলন শুরু হলো, তখন সমাজের শক্তিশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতেই প্রায় সমস্ত সম্পত্তি চলে গেল। তারাই হলো সম্পত্তির মালিক। ফলে অবশিষ্ট সকল লোকই হলো সম্পত্তিবিহীন। এখন এই দু'দলের মাঝে সম্পত্তির মালিকদল সম্পত্তি নিরাপদে ভোগ করার জন্যে রাষ্ট্র নামক যন্ত্রটির উদ্ভাবন করলো। সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা বজায় রাখাই হলো রাষ্ট্রের কাজ। এজন্যে জুলুম নির্যাতন যা কিছুই করা প্রয়োজন বোধহয়, তা

সবকিছুই করা হয় দ্বিধাহীনভাবে। মার্কস ও এঞ্জেলস বিরচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে রাষ্ট্র সম্পর্কে বলা হয়েছে— রাষ্ট্র হচ্ছে একটি শ্রেণীকে ধ্বংস করার বাহনযন্ত্র। ইহা একটি দলকে বিনাশ ও তার ওপর জুলুম-নির্যাতনের স্রোত চালানোর জন্যে একটি সংগঠন।

তবে সমাজতান্ত্রিক যুগের সমাজ হবে Classless society— শ্রেণীহীন সমাজ; সেখানে Dominating class-এরও অবসান হবে। ফলে রাষ্ট্র নামক যন্ত্রটির আর কোন প্রয়োজনই থাকবে না। সেখানে মার্কসের ভাষায় State will wither away— রাষ্ট্র আপনার থেকেই লোপ পেয়ে যাবে। অবশ্য তার আগে শ্রেণী সংগ্রামের সাফল্যের মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠিত হবে।

মার্কসীয় দর্শনে পরিবার

মার্কসীয় দর্শনে রাষ্ট্রের মতো বিবাহ ও পরিবার প্রথাও Private property system-এরই পরিণতি। স্ত্রী সেখানে অন্যান্য সম্পত্তির মতোই পুরুষের সম্পত্তি, মার্কসের ভাষায় Instrument of production এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা বন্ধ হয়ে গেলেই শ্রেণীহীন সমাজে পরিবার বিলুপ্ত হবে।

সংক্ষেপে মার্কসীয় চিন্তাধারার পরিচয় পেশ করা হলো। এ চিন্তাধারাই হচ্ছে কমিউনিজমের দার্শনিক ভিত্তি। বর্তমান সময় বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ও পাশ্চাত্য ধরণের মনমগজের লোকদের চিন্তায় দৃষ্টিভঙ্গিতে এর প্রভাব তীব্রভাবে বিদ্যমান। কাজেই যতদিন এ চিন্তাধারা সমাজমনে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে ততদিন সেখানে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থান লাভ করতে পারে না। তাই এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমালোচনা করে এর অন্তসারশূন্যতা সমাজ সমক্ষে উজ্জল করে ধরতে হবে। মানবমনকে মুক্ত করতে হবে মার্কসবাদের কুজ্ঝটিকা থেকে।

সমালোচনা

মার্কসীয় দর্শনের প্রায় সব কয়টি দিকই আমি সংক্ষেপে পেশ করলাম। এ সবের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে মার্কসবাদ। মার্কসীয় দর্শনের গোড়ার কথাই

এই। এদিকগুলোকে সামনে রেখে চিন্তা করলেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, মার্কসীয় দর্শনানুসারী জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র কিরূপ হতে পারে। কিন্তু তবু এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। তাই এবারে আমি এর সমালোচনা শুরু করবো।

সমালোচনার লক্ষ্য

মূল সমালোচনা শুরু করার পূর্বে দুটো কথা বলা দরকার। পয়লা কথা এই যে, এ সমালোচনার মূলে আমার মনে কোন অন্ধবিদ্বেষ নেই, নিতান্ত সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্য লাভের ঐকান্তিক আগ্রহই আমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করছে। একেতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ধবিদ্বেষ মূলতঃই অবাঞ্ছনীয়, দ্বিতীয়ত প্রকৃত সত্যকে পেতে হলে অন্ধবিশ্বাসকে পরিহার করতে হবে। এ ব্যাপারে একান্ত প্রয়োজন মার্কসের— শুধু মার্কসেরই নয়, সম্ভব মতো সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই যুক্তির মানদণ্ডে যাচাই করে, বাস্তবতার নিক্তিতে ওজন করে প্রত্যেকটি কথাই গ্রহণ করা কিংবা বর্জন করা। ঠিক এই দৃষ্টিতেই আমি মার্কসের দার্শনিক মতবাদসমূহের বিচার ও যাচাই করবো।

মার্কসের পরিবেশ

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মার্কসের চিন্তাধারার সঠিক বিচার তখনি হতে পারে, যদি তাকে তার পরিবেশে-পরিস্থিতিকে সমুখে রেখে যাচাই করা হয়। অন্যথায় না তার চিন্তাধারাকে সঠিকরূপে উপলব্ধি করা যাবে আর না হবে তার প্রতি সুবিচার। এ জন্যে আমি মার্কসের পরিবেশ এবং তার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা প্রথমেই পেশ করবো।

মার্কস রাইনল্যান্ড-এর এক ইয়াহূদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াহূদী বংশজাত হওয়ার কারণে খৃস্টান ধর্মের প্রতি অন্ধবিদ্বেষ ছিল তার বংশানুক্রমিক ও মজ্জাগত। এই কারণেই মার্কস শুরু থেকেই ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চিন্তা-গবেষণা শুরু করেছিলেন। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান হিসেবে তিনি শিক্ষা দীক্ষার বিপুল সুযোগ পেয়েছিলেন। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়েই তার চিন্তার বীজ উপ্ত হয়। তখন হেগেলের দার্শনিক চিন্তাই ছিল একমাত্র প্রভাবশালী চিন্তা মত।

মার্কস তার চিন্তাধারা আকণ্ঠ পান করেছিলেন। পরে তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। এ সময়েই সেকালের অপরাপর দার্শনিকদের দার্শনিক গ্রন্থাবলী গভীরভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ পান। শুধু অধ্যয়নই নয়, তিনি তাদের চিন্তাধারা থেকে রীতিমত মাল-মশলা গ্রহণ করে নিজস্ব দার্শনিক মত রচনা করেন। জাতীয় রাষ্ট্রীয় মালিকানার মত গ্রহণ করেন Mamlyও Bazard থেকে। ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ফয়েরবাখ, Feuer Spinoz-র কাছ থেকে গ্রহণ করেন। শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কিত ধারণা তিনি লাভ করেন st. simon, Thierry ও Mignet- এর গ্রন্থাবলী থেকে। শ্রমিকদের ডিকটেটরশিপ-এর ধারণা গ্রহণ করেন অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের চিন্তাবিদ Babeue থেকে। সমাজের অর্থনৈতিক শোষণ এবং তা দূর করার জন্যে সমগ্র উৎপাদন উপায়কে রাষ্ট্রায়ত্ত করণের পরিকল্পনা মার্কসের পূর্বে পেশ করেছিলেন Fouier, Bary এবং Thompson প্রমুখ চিন্তাবিদগণ।

ঠিক এ কারণেই মার্কসের চিন্তাধারায় রয়েছে গোজামিল। এক কথায় তার চিন্তাধারা হচ্ছে অর্থদর্শন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ। তার রচিত জীবন পন্থায় ডারউইনের ক্রম-বিকাশবাদ, মেকিয়াভেলীর রাষ্ট্র দর্শন, রবার্ট উয়েন-এর তীব্রতিক্তসমূহবাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতার গভীর চাপ রয়েছে বলে স্পষ্ট মনে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একথাও আমাদের মনে রাখা বোধহয় আবশ্যক যে, মার্কসীয় দর্শনে স্রষ্টা সম্পর্কিত মনস্তত্ত্বই ছিল অত্যন্ত হিংস্র, জিঘাংসু ও প্রতিশোধ আক্রোশে উচ্ছ্বসিত। কাজেই তার রচিত চিন্তাধারায়ও যে ঠিক সে ভাবধারাই প্রতিভাত হবে, তাতে আর সন্দেহ কি।

এসব বলার মূলে আমার উদ্দেশ্য এই যে, মার্কসের মতবাদ অনুধাবন ও সত্যাসত্য বিচারের সময় এসব কথা সকলেরই স্মৃতিপটে জাগরুক থাকা আমি দরকার বলে মনে করি।

এবারে একটি একটি করে মার্কসের মতবাদ সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

১. ডায়ালেকটিকবাদ

"ডায়ালেকটিক্যাল প্রোসেস"— নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করার ব্যাপারে হেগেল মার্কস দু'জনই ধোকা খেয়ে গেছেন। "Confict of opposits"

'বিপরীতসমূহের দ্বন্দ্ব' সম্পর্কে হেগেলের মূল কথাটির সত্যতা অবশ্য অস্বীকার করা হচ্ছে না। সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করা হচ্ছে না যে, প্রত্যেকটি ব্যবস্থা যখন এক বিশেষ স্তর পর্যন্ত পৌছায়, তখন তারই মাঝ থেকে বিপরীত শক্তি বের হয়ে এক নবতর ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ ব্যবস্থা পূর্ববর্তী ব্যবস্থার বিপরীত হয় এবং পূর্ব ব্যবস্থার ওপর জয়ী হয়।

এ পর্যন্ত হেগেলের দাবি ঠিকই আছে। কিন্তু পরবর্তী কথা— এই দাবি যে, প্রত্যেক নবতর ধারণা বাতিলকৃত ধারণার সাথে মিলে এক নবতর unit রচনা করে এবং নূতন unit বাতিলকৃত ধারণার তুলনায় এই হিসেবে প্রশস্ততর হয় যে, শেষেরটিতে পূর্বটির অংশ ও স্মৃতি অবশিষ্ট থাকে— এ দাবি স্বীকার করা যায় না। কেননা এই দাবিটি Logical contradiction ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত ধারণার মাঝ থেকে তার বিপরীত আত্মপ্রকাশ করে। পরে বলা হয়েছে যে, এই বিপরীতটি পূর্ববর্তীর সার অংশের সাথে মিলে মিশে এক নবতর unit সৃষ্টি করে। এখানে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ঃ পরবর্তী জিনিসকে প্রথমের 'বিপরীত' বলা হবে কেন ? কেবল এই জন্যেই কি যে, তা পূর্ববর্তী ধারণাকে বাতিল করে ? কেননা তাকে বিপরীত বলার অর্থ হবে যে, মূল ধারণা এবং তার 'বিপরীতের' মাঝে ঐক্য ও সাদৃশ্য মিলনের কোন সূত্রই পাওয়া যায় না। তাহলে এ দুয়ের মিলনে এক তৃতীয় নবতর unit-এর উদ্ভব কি করে হতে পারে ? আর যদি স্বীকার করা হয় যে, উভয়ের মাঝে কোন প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য ও মিলন সূত্র বর্তমান রয়েছে, তাহলে শেষেরটিকে প্রথমটির 'বিপরীত' ধরে নেয়া কি করে সম্ভব ? .... তাতো সুস্পষ্ট রূপে ভুল হবে। কেননা এ 'বিপরীতের' মাঝে বিরোধ ও পূর্ণমাত্রার বৈপরিত্ব থাকাই স্বাভাবিক। তা হলে কোন স্তরেই উভয়ের সংমিশ্রণে কোন unit গড়ে উঠতে পারে না। আর যদি গড়ে ওঠে বলেই ধরা হয়, তাহলে মনে করতে হবে যে, উভয়ের মাঝে কোন বিরোধ বা বৈপরিত্য নেই, আছে গভীর বন্ধুতা, সামঞ্জস্য ঐক্য ও সাদৃশ্য। তাহলে এদের 'পরস্পর বিপরীত' বলা সুস্পষ্টরূপে ভুল।

হেগেলের দৃষ্টান্ত বীজ ও গাছ এ ব্যাপারে মোটেই খাপ খায় না। আর যদি বলা হয় যে, শেষের বিপরীতটি প্রথমের সবদিক ও সব অংশের সাথে দ্বন্দ্ব করে না, করে কোন কোনটির সাথে, তাহলে মানতে হবে যে,

বিপরীতসমূহের দ্বন্দ্ব লজিকের ভিত্তিতে চলে— চিন্তা-ধারণা ব্যবস্থা সমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব খুব বুঝে শুনে বিজ্ঞতা ও সর্তকতা স চলে। অথচ এ কথার না আছে কোন যৌক্তিকতা, না আছে বৈজ্ঞা ভিত্তি। একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাক ঃ ক, ধারণা; এর বিপরীত হচ্ছে খ, হেগেলের শেষ জবাবের দৃষ্টিতে ক-এর কয়েকটি দিক। মনে করা যেতে পারে, তাদের নাম হচ্ছে ক ১. ক ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫। এর মধ্যে প্রথম তিনটি দুর্বল, খ তার Negation করে, কিন্তু 'ক'র শেষ দুটি দিক দুর্বল নয়, তাই 'খ' তার Negation করে না— কিছু দিন দ্বন্দ্ব করার পর 'খ' এদেরকে নিজের মধ্যে হজম করে নেয়। এ হিসেবে ক-এর প্রথম তিন দিক খ যার Negation করে তাদের বিপরীত।— বিপরীত বলেই তার Negation করে, বিপরীত না হলে কেন করবে! আর ক ৪ ও ক ৫ কে নিজের মধ্যে Absorb করে নেয়— শুষে হজম করে নেয়, কাজেই খ-র সাথে ক ৪ ও ক ৫-এর কোন দ্বন্দ্ব নেই— বরং কিছু বন্ধুতা আছে। এখন দাঁড়ালো এই খ .... ক'র বিপরীত।

খ— ক ১, ক ২, ক ৩-এর বিপরীত, কেননা খ এর Negation করে। 'খ'— ক ৪ও ক ৫-এর বিপরীত নয়, কেননা 'খ' তার Negation করেনা। ফলে 'ক ১' 'ক ২' ও 'ক ৩' —ক ৪, ক ৫-এর সম্পূর্ণ বিপরীত ও উল্টা হবে। তাহলে ক-ই হবে ক-এর বিপরীত। আর তাহলে মেনে নিতে হয় যে, দুই পরস্পর বিপরীত— বা বিরোধী অংশ একই ধারণার Unit-এ একত্রিত হতে পারে। অথচ দুই বিপরীতের সমন্বয় তো চিরকালই অসম্ভব বলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চূড়ান্তরূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

কাজেই হেগেলের এ Philosophy of opposits ভুল।

মার্কস হেগেলেরই Dialectical process গ্রহণ করে সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ ভ্রান্ত ডায়ালেকটিক পদ্ধতির ওপরই স্থাপিত হয়েছে কার্লমার্কসের ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের স্বপ্ন প্রাসাদ।

মার্কস প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাঝ থেকে যেসব বিপরীত শক্তি আত্মপ্রকাশ করে তা কিছু দিনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের পর এক নবতর অর্থব্যবস্থা গঠন করে, যা পূর্বতন ব্যবস্থার ওপর জয়ী হয়,

তাকে নির্মূল করে— নিঃশেষ করে দেয়। কিন্তু তার উত্তম ও উৎকৃষ্ট অংশগুলো নিজের মধ্যে শুষে নেয়। কাজেই এই নবতর অর্থ ব্যবস্থা পূর্ববর্তী ব্যবস্থা থেকে এই হিসেবে উন্নত যে, পূর্ববর্তীর উচ্চ বৈশিষ্ট্যগুলো এই শেষেরটির মধ্যে বর্তমানে থেকে যায়।

Russel এই দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, হেগেলের মতে জীবন 'লজিকের' অধীন। কিন্তু বাস্তবিকই কি জীবন ও লজিকের মাঝে কোন অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে ? ....

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফল স্বরূপ কোন উন্নত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া কি সকল সময়ই জরুরী অবধারিত ? .... রোমান সাম্রাজ্যের ওপর বর্বর উপজাতিদের আক্রমণে কোন কল্যাণময় অর্থ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, আন্দালুসিয়া থেকে মুসলিমদের বহিষ্কারের ফলে কোন উন্নত ব্যবস্থা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অর্থাৎ ইতিহাস মার্কসের পক্ষে নয়— ইতিহাসের ভিত্তিতেই জিজ্ঞেস করা যায়, জায়গীরদারী (Feudal) ব্যবস্থার পর যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্টিত হলো, তখন তাতে জায়গীরদারী ব্যবস্থার কোন উচ্চতর বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত থাকলো কি ? কিংবা গোলামী ব্যবস্থার অবসানের পর যখন জায়গীরদারী ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল, তাতেই বা গোলামী যুগের কোন্ বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট ছিল ? চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, এর কোন পরবর্তী ব্যবস্থায়ই তার পূর্ববর্তী ব্যবস্থার কোন বৈশিষ্ট্যই বাকী থাকে নি। কেননা কোন চিন্তা বা কর্মমুখর আন্দোলনের লজিক্যাল পূর্ণতার পর তার বিপরীত ভাবধারা যখন ফুটে বের হয়, তখন নতুন ভাবধারা পূর্বতন আন্দোলনের সাথে মিলে কোন উন্নততর ও নবতর সংযোজন সৃষ্টি করে না। বরং প্রায়শঃই দেখা যায়, পরবর্তীটি পূর্ববর্তীর মূলোৎপাটন করে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আন্দোলনেরই ভিত্তি স্থাপন করে, সেখানে পূর্ববর্তী আন্দোলনের সকল দিকই নিঃশেষ হয়ে যায়।

মার্কসের ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম সম্পর্কে আরো প্রশ্ন ওঠে। মার্কসের মতে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির মূলে প্রকৃত কারণ ও উদ্‌গাতা (Factor) হচ্ছে অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও

সংগ্রাম। শ্রেণী সংগ্রাম না হলে দ্বন্দ্বিক পদ্ধতিও কোন কাজ করে না। অথচ সকল প্রকার গতি ও উন্নতিমূলক কার্যক্রমের ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ওপর। মার্কস সেকথা বলেন নি। শ্রেণী সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির পরিণাম কি হবে ? কেননা মার্কসের মতে কমিউনিস্ট সমাজে শ্রেণী পার্থক্য বলতে কিছুই থাকবে না। এটা Classless society হবে, অতএব Class war বলতেও সেখানে কিছু থাকবে না। তা হলে কমিউনিস্ট সমাজে যে উন্নতি ও অগ্রতি সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হয়ে যাবে সে কথা কি মার্কসবাদীরা একবারও ভেবে দেখেছেন ?

আসলে এর কোন জবাব মার্কসের নিকট নেই। যা তিনি বলতে চেয়েছেন, তা গোজামিল ছাড়া কিছুই নয়, কোন চিন্তাশীল মানুষই তাতে Convinced হতে পারে না।

২. অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ

মার্কসীয় দর্শনে সকল প্রকার সামাজিক পরিবর্তন বিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে অর্থনীতি— Economic factor; আর একেই বলে Economic determinism; কিন্তু মুশকিল এই যে, Economic factor বলতে মার্কস কি বোঝাতে চান, সে সম্পর্কে সব মার্কসবাদীই একমত নন। সে যাই হোক— এ ব্যাপারে যত মতভেদই হোক না কেন এবং মার্কসবাদীদের এ ব্যাপারে যত অজুহাতই থাক না কেন, সবকিছু পরিবর্তন বিবর্তনের মূলে অর্থনীতিই যে মূল, এতে তাদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। অথচ সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস যারা অধ্যয়ন করেছেন তাদের এ কথায় কোন দ্বিমত নেই যে, সামাজিক পরিবর্তন বিবর্তনের বহুবিধ কারণ থাকতে পারে— থাকেও। তন্মধ্যে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বা ব্যবস্থাও যে একটা কারণ— অনেক সময় অন্যতম প্রধান কারণ— হয়ে দাঁড়ায়, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তাই মার্কসের এই আর্থিক ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ সত্যি নয়— আংশিক সত্য, তাও মেনে নিতে কোন দ্বিধা নেই। অর্থাৎ সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে অর্থনীতিও The factor নয়— one of the factors মাত্র। অতএব মার্কসের ইতিহাস ব্যাখ্যা একদেশদর্শী, বহুবিধ শক্তির পারস্পরিক

ঘাত-প্রতিঘাতেই সামাজিক পরবর্তন সূচিত হয়। তাই মার্কসের Monistic interpretation of history রীতিমত ভুল, বহুবিধ বা pluralistic interpretation of history-ই অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত।

কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। অর্থনীতি সবকিছুর মূলে এবং অর্থনীতিতে পরিবর্তন ঘটলে তবেই অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে, এ কথা না হয় কিছু সময়ের জন্য ধরে নেয়া গেল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অর্থনীতিতেই কেন অন্যান্য সব কিছুর আগে পরিবর্তন ঘটে ? —এ প্রশ্নের কোন উত্তরই মার্কসবাদীরা দিতে পারেন নি। অর্থনীতিকে যদি স্বয়ংক্রিয়াশীল— Self -starter- ও ধরে নেয়া যায়, তবুও অর্থনীতির সে অজ্ঞেয় রহস্যময় রূপ রহস্যই থেকে যায়। Sorokin -এর ভাষায় বলতে হয়, The hypothesis of the self-starter amounts to the worst kind of mysticism where the economic factor economics a kind of god.

সমাজবিপ্লব ও শ্রেণী সংগ্রাম

মার্কসের মতে কেবল শ্রেণী সংগ্রামই হচ্ছে সমাজ বিবর্তনের একমাত্র নিয়ামক। তিনি ইতিহাসে কেবল শ্রেণী সংগ্রামই দেখতে পেয়েছেন। তাই সংগ্রাম এবং সংঘর্ষ ছাড়াও যে সমাজে কোন পরিবর্তন আসতে পারে তা মার্কসের চোখে ধরা পড়েনি। তাই এ হচ্ছে an inadquate explanation— বাস্তবিক সংঘর্ষই একমাত্র শক্তি নয়। সমাজে সদিচ্ছা ও সহযোগিতাও বিবর্তনের জন্য বহু কাজ করে। ক্রোপাটিন-এর মতে ঃ The law of organic evolution is primarily a law of mutual aid, not of conflict.

কেবল সহযোগিতা ও বিবর্তনের পারস্পরিক সদিচ্ছার ফলেই সমাজে পরিবর্তন এসেছে এ কথা বলাও যেমন অতিরঞ্জন, তেমনি কেবল সংঘর্ষই হচ্ছে পরিবর্তনের একমাত্র নিয়ামক, একথা বলাও আর একটি অতি বড় অতিরঞ্জন। তবে শেষে অতিরঞ্জন অপেক্ষা প্রথমোল্লেখিত অতিরঞ্জনই যুক্তিসঙ্গত। অতএব শুধু Conflict বা সংঘর্ষের চশমায় মার্কসবাদ রীতিমত একপেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Sorokin-এর ভাষায় ঃ "They have taken only one side of the coin and forgetten the other"

তারপর এ Conflict-কে মার্কস কেবল অর্থনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করতে চান। তার মানে, সমাজে যত সংঘর্ষ হচ্ছে তা কেবল অর্থনীতির জন্যেই, অন্য কিছুর কারণে নয়। কিন্তু একথা রীতিমত ভুল। সামাজিক সংঘর্ষের ইতিহাসে অর্থনীতিই একমাত্র কারণ নয়, তার মাঝে আদর্শবাদও যে একটা প্রধান কারণ, তা ইতিহাসবিদ মাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য। ফরাসী বিপ্লবই তার বড় দৃষ্টান্ত। মার্কসের মতে এ বিপ্লব হয়েছিল কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু আমরা দেখছি তার বিপরীত। ফ্রান্সের তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যারা আওয়াজ তুলেছিলেন তাঁরা ছিলেন সে দেশের চিন্তাশীল শিক্ষিত সমাজ— সমাজের Inteligentsia। আর তারা কোন অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য হতে পারেন না— এবং সে কারণও ছিল না সেখানে। সংগ্রামীদের মধ্যে যেমন ছিল গরীব লোক, তেমনি ছিল বিপুল সংখ্যক স্বচ্ছল অর্থশালী লোকও। ইউরোপের ধর্মীয় যুদ্ধসমূহ এইরূপ। কাজেই সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস কেবল Economice determinism-ই সত্য নয় তা-ই নয়, সেই সঙ্গে Determinism বলতে সমাজ বিপ্লবের ইতিহাসের কোন জিনিসই নেই।

জড়বাদ বা বস্তুবাদ

মার্কসীয় দর্শনের মূলকথা হচ্ছে জড়বাদ। এ দুনিয়ায় 'জড়ই' হলো আদি অকৃত্রিম ও স্বয়ম্ভু। ক্রমঅভিব্যক্তির পথে এ 'জড়' থেকেই প্রাণ, চেতনা বা মনের সৃষ্টি। অর্থাৎ মার্কসীয় মতে বস্তুই জীবনের রূপ পরিগ্রহ করেছে, সে জীবন থেকেই চেতনা এবং সেই চেতনা থেকেই মনের সত্তা গড়ে উঠেছে। খোদা বলতে তাদের মনে কোন কিছু নেই।

কিন্তু এ মতের পিছনে যথার্থ কোন বৈজ্ঞানিক সমর্থন আছে কি ? আঠারো শতকের বিজ্ঞান নয়, উনবিংশ অথবা বিংশ শতকের বিজ্ঞান— আধুনিক বিজ্ঞান এ বস্তুবাদ স্বীকার করে কি ? তা এ জন্যে বলছি যে, আঠারো শতকের বিজ্ঞান ছিল নেহাতই যান্ত্রিক, যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগ, জড়

বিজ্ঞান যুগ। সে যুগে 'জড়' নিয়েই ছিল বিজ্ঞানের কারবার। উদ্ভিদ থেকে মানুষ— সবই ছিল যন্ত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ। মন বা প্রাণকে সে দিন বলা হতো 'ও কিছু নয়, ও শুধু কতগুলো জড়কোষের সমবায়ের ফল মাত্র।' দৃষ্টান্ত হিসেবে গলিত মাংসের মাঝে নিজ থেকেই অসংখ্য জীবকণা সৃষ্টি হওয়ার কথা উল্লেখ করা হতো। কিন্তু পরের যুগে— লুই পাস্তুর-এর জীবানু বা bactaria আবিষ্কারের পর এ ধারণা তাদের বদলাতে হয়েছে। এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, জীব তথা জীবন থেকেই জীবনের সৃষ্টি, আপনা থেকে— এ হতে পারে না। কিন্তু যে জীব তথা জীবন থেকে সৃষ্টিধারা শুরু হলো তার মূল কোথায় ? প্রথম জীব কণাটির স্রষ্টা কে ? আর এই জড় পৃথিবীতেই বা জীবনের উদ্‌গম হলো কি করে ? জড়বাদীরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। .... অন্ততঃ সত্যিকার বিজ্ঞানসম্মত কোন উত্তরই আজ পর্যন্ত দেয়া সম্ভব হয় নি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্থূল দেহকে আশ্রয় না করলে প্রাণ কখনো আত্মপ্রকাশ করে না। তাই যদি বলি ঃ প্রাণশক্তি চিরকালই ছিল, শুধু যোগ্য আধার পাওয়ার অপেক্ষায় বসেছিল। যখন প্রাণ সে পাত্র পেল তখনই সে প্রাণ আত্মপ্রকাশ করলো। এই প্রাণেরই স্রষ্টা হচ্ছে আল্লাহ— দেহেরও যেমন জড়েরও স্রষ্টা তিনি। তাহলে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একথাটা অযৌক্তিক হবে কি ?

বস্তুবাদ বা জড়বাদ যে আজ বাতিল হয়ে আছে, তা আমরা আর এক দিক থেকেও দেখতে পাচ্ছি। বস্তু কি, বস্তুর শেষ কোথায় ?

ঊনবিংশ শতকেও এর শেষ কথা ছিল Atom বা অণু। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে একথা মিথ্যে হয়ে গেছে। এখন ইলেকট্রন ও প্রোটন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, জড়বস্তু আর জড় নয়; বরং নেহাতই সূক্ষ্ম শক্তির পুঞ্জীভুত বাহ্যরূপ মাত্র। তাই বলতে হয়, জড়বাদীদের জড়ই আজ জড়ত্ব হারিয়ে ফেলেছে— Matter বা বস্তু এখন আর বস্তু নয়। বস্তুর এই

১. এই পর্যায়ে ইমাম খোমেইনীর নেতৃত্বে আধুনিক ইরানে যে সর্বাত্মক ইসলামী চিন্তা সাধিত হয়েছে, মার্কসীয় দর্শনের ভ্রান্তি প্রমাণের জন্যে তা অকাট্য সাক্ষ্য। বিপ্লবীরা মার্কসকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিল ঃ 'তোমার মতে কেবল অর্থনৈতিক কারণেই বিপ্লব হয়। তুমি কবর থেকে বের হয়ে এসে দেখে যাও আমরা কোন অর্থনৈতিক কারণে বিপ্লব করিনি বিপ্লব করেছি কেবলমাত্র ঈমান ও ইসলামের জন্য'।

অবস্থা দেখে Russell বলেছিলেন, "জড়বাদ বেঁচে নেই, তার মৃত্যু ঘটেছে।' matter এবং mind-এর ব্যাখ্যায় তাই বলতে হবে ঃ বিশ্বসংসারের সব কিছুর আড়ালে সর্বব্যাপী এমন এক মহান— মহান মন— রয়েছেন, যাঁর ইচ্ছাশক্তিই কাজ করেছে সবকিছুর উর্ধ্বে। বর্তমান প্রকৃতি ও পদার্থ বিজ্ঞান তার বস্তুভিত্তি ত্যাগ করেছে— মোড় ঘুরিয়ে নিয়েছে। জিন্‌স্-এর ভাষায় Modern physics is moving in the direction of philosophical idealism. অতএব জড়বাদ বস্তুবাদের ওপর ভিত্তি করে কোন জীবন দর্শন দাঁড় করানো একেবারেই অর্থহীন। এজন্যে যে scientific materialism is no more scientific today । তাই রুশ বিপ্লব যেমন যুক্তিহীন, তেমনি ভিত্তিহীন রাশিয়ান রাষ্ট্রের অবস্থিতি। এখনো আরো দু'টো কথা রয়ে যায়। 'বস্তু যে চিরন্তন— চিরকাল থেকেই এর অস্তিত্ব, একথার প্রমাণ কোথায় ? 'বস্তু'কে তো মানুষই অনুভব করতে পেরেছে। মানুষের চেতনা ও মন সৃষ্টির পূর্বে এ দুনিয়ায় কি ছিল, আর কি ছিল না, সে জ্ঞান লাভ করার জন্যে তখন কে উপস্থিত ছিল ? জড়বাদ বা বস্তুবিজ্ঞান তা কি করে জানতে পারে ?

এর জবাবে মার্কসবাদীরা Fossils-কে নিদর্শন স্বরূপ পেশ করেন। কিন্তু তাতে বরং একথাই প্রমাণিত হয় যে, সরাসরি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যের জ্ঞান অর্জনই মানুষের পক্ষে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় নয়। বরং কোন জিনিসের নিদর্শন— Sign— দেখেও অপর কোন জিনিসের অস্তিত্বের সন্ধান মেলে এবং তা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায়। আধুনিক দর্শনের ভাষায় তাকে বলা হবে Inference, তাহলে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার যৌক্তিকতা কি হতে পারে, যখন তার অস্তিত্বের প্রমাণ করছে আকাশ বাতাস পৃথিবী— গোটা দৃশ্যমান জগৎ এবং প্রতিটি অণু-পরমাণু ?

দ্বিতীয় 'বস্তু' নিজে নিজেই কি করে অস্তিত্ব লাভ করলো ? মার্কসবাদীরা কি প্রমাণ করতে পারেন যে, 'বস্তু' সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বর্তমান ছিল। নিজে নিজেই কি তা বর্তমান অস্তিত্বমান হয়েছিল ? তা দাবি করা হলে বলতে হয়, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান ছাড়া আর কোন জ্ঞানকেই যারা

কোন জ্ঞান বলে 'বিশ্বাস করে না, তাদের পক্ষে এটা নিতান্ত গোঁড়ামী ছাড়া আর কিছু নয়। আর 'বস্তু'কেই যদি এভাবে স্বীকার করা যেতে পারে, তাহলে আল্লাহ্‌কে স্বীকার করতে বাধে কোথায় ? 'বস্তু' যদি Self existent হতে পারে, তবে আল্লাহ তা হতে পারবেন না কেন ?

প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্‌ই যদি বিশ্ব-নিখিলের স্রষ্টা হবেন, তাহলে আমরা তাঁকে দেখতে পারছি না কেন? এর উত্তর খুবই সহজ এবং সোজা। আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেবে যে, যে জিনিসের অস্তিত্ব যত স্থূল, তা তত সহজেই দেখা যায়, অনুভব করা যায়। আর যে জিনিসের সত্তা যত সূক্ষ্ম, তা দেখা ও অনুভব করা ততই কঠিন। তাছাড়া অস্তিত্বের মর্যাদা ও স্তর বা পর্যায়ের দৃষ্টিতে যে জিনিস যত বেশী উচ্চ ও উন্নত, সে জিনিস সে হিসেবেই তত সূক্ষ্ম— ইন্দ্রিয় ও অনুভূতির নাগালের তত বাইরে। মানুষের বাহ্যদেহ আকার-আকৃতি রূপ স্থূল তা সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য। কিন্তু তার চিরত্র, তার গুণ ও মেধা তাকি একজনকে দেখলেই বুঝতে পারা যায়— অনুভব করা যায় ?

আরো দেখুন। মানুষের বাহ্য দেহের তুলনায় তার ভিতরকার প্রাণ— রূহ কত সূক্ষ্ম। তাই মানুষের স্থূল দেহ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ ধরা-ছোঁয়া গেলেও তার রূহকে না ধরা যায়, না দেখা যায়। শুধু মাত্র তার ক্রিয়াকাণ্ডের সাহায্যে তার অস্তিত্বই অনুভব করা যায় মাত্র। পৃথিবীতে সদা প্রবাহমান বাতাসও কি সেই রূপ নয় ?

তাই আল্লাহ্ কোন স্থূল জিনিসের নাম নয়। সূক্ষ্মতায় তিনি তুলনাহীন। এ কারণে ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে তাঁকে দেখা সম্ভব নয়। আর অস্তিত্ব ও সত্তার মর্যাদা এবং মাত্রার বিচারেও তিনি সর্বোচ্চ, তাই তাঁকে অনুভব করা ততই কঠিন। আরো একটি কথা আছে। মানুষের দেহের অস্তিত্ব অনুভবের জন্যে স্থূলযন্ত্র আবশ্যক, যেমন চোখ, হাত ইত্যাদি; কিন্তু এই স্থূল ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা মানুষের মেধা ও প্রতিভাকে ধরা যায় না, বোঝা যায় না। আল্লাহকে দেখার জন্যে যে দৃষ্টিশক্তির দরকার, তা এই বস্তুজগতে সম্ভব নয়। বস্তুজগত শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ্‌কেও দেখা যাবে বইকি।

৫. জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে সূত্র এবং চিরস্থায়ী সত্য

External Experiment বাহ্যিক অভিজ্ঞতা ছাড়া মার্কসীয় দর্শনে জ্ঞান লাভের আর কোন উৎসই স্বীকৃত নয়। তাই ওহী, ইলহাম বা চিরস্থায়ী সত্যকে মার্কসীয় দর্শন স্বীকার করে না।

এ সম্পর্কে প্রশ্ন দাঁড়ায়, মানুষ তার যাবতীয় চিন্তা ও জ্ঞানসম্পদ বাহ্যজগত থেকে গ্রহণ করে, একথা না হয় মেনে নিলাম; কিন্তু যে মানবীয় মন এই জ্ঞান আহরণ করে, সেই জ্ঞানের রূপায়ণে ও সুসংবদ্ধ করণে তার নিজের অর্থাৎ মনের কি ভূমিকা থাকে ? তাতে স্বয়ং মনের কি কোন অংশই থাকে না ? ..... এমন কি জ্ঞান আহরণ করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে? মন নিজ থেকে তাতে কোনরূপ রদবদল না করেই কি তা গ্রহণ করে ? অন্যকথায়, বাহ্যজগত থেকে জ্ঞান আহরণে মনের ভূমিকা কি নিছক একটি ক্যামেরার মতো Receiving-এর কাজ করার; না কি অন্য কিছুর ? তা-ই যদি হবে তাহলে তো একই সমাজে একই সময়ে লালিত-পালিত সকল লোকের চিন্তা ও মতবাদ সর্বতোভাবে একই রকমের হওয়া আবশ্যক। কেননা সকলের অভিজ্ঞতাই সমানভাবে এক ও অভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা সত্য হয় না। মন এক স্বাধীন ও স্বয়ং সম্পূর্ণ রূপায়ণ শক্তি, জ্ঞানের সম্পদ ও তথ্য বাহির থেকে গ্রহণ করলেও মন তাকে হুবহু গ্রহণ করেন না, যেমন ক্যামেরা গ্রহণ করে। বরং মন তাকে নিজস্ব করে নিজের ইচ্ছামত ঢেলে নেয়। এ কারণেই মানুষের চিন্তা ও মতাদর্শ রচনাকারী শক্তি হচ্ছে মানুষের মন। নিছক বাহ্য অভিজ্ঞতাই শুধু নয়, এই মন বিভিন্ন— এই মনের শক্তিও বিভিন্ন। নবী রাসূলগণের মন ও দার্শনিক বিজ্ঞানীদের মনের মাঝে আসমান জমিনের তফাৎ রয়েছে। সকলেই বাহ্যজগত থেকে জ্ঞান আহরণ করে। তবে বাহ্যজগত সকলের এক নয়। চিন্তাবিদ দার্শনিকগণ যেখানে এই দুনিয়ার চালচলন গতিধারা ও অবস্থার মধ্যে থেকে জ্ঞান আহরণ করেন, নবী-রাসূলগণ সেখানে জ্ঞান গ্রহণ করেন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। চিন্তাশীল দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের আহরিত জ্ঞান যদি মানুষের জৈব জীবনের জন্যে প্রয়োজন, তাহলে মানুষের মানবিক তথা নৈতিক জীবনের জন্যে প্রয়োজন নবী রাসূলগণ আহরিত জ্ঞান। মার্কসীয় দর্শনে কোন

চিরস্থায়ী সত্যও স্বীকৃত নয়। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য শুধু এতটুকু যে, সত্য যদি কেবল সময়, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা-ভিত্তিকই হয়— হয় আপেক্ষিক, এবং সময় কাল ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে সত্যও যদি বদলে যায়, আর সত্যের এই পরিবর্তন যদি হয় এই কারণে যে, যে নিয়মকে ভিত্তি করে এ সত্য দাঁড়িয়েছিল, সে আইন ও নিয়মেরই পরিবর্তন হয়ে গেছে, তা হলে বলতে হয় এ বিশ্বজগতই এক দূর্জ্ঞেয় রহস্য ছাড়া আর কিছু নয়। আর বিজ্ঞানীগণ যত মত, চিন্তা ও আদর্শের কথা বলেছেন, পেশ করেছেন যত তত্ত্ব ও তথ্য, তা সবই ভুলে ভরা, বিশ্বাস অযোগ্য। কেননা বিশ্ব-নিখিলকে আমরা কেবল সাধারণ আইন (General laws)-এর দ্বারাই বুঝতে পারি। কিন্তু এই আইন যদি পরিবর্তনশীলই হয়, তাহলে দুনিয়ার ঘটনাবলীর নির্ভরযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করা কখনই সম্ভব হতে পারে না। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদই ধরুন, বর্তমানে এ এক সর্ববাদী সম্মত মত। কিন্তু প্রাকৃতিক আইনকে যদি নিত্য পরিবর্তনশীলই ধরে নেয়া হয়, তাহলে এই আপেক্ষিকবাদ-কেই বা আমরা কিভাবে নির্ভরযোগ্য মনে করতে পারি? আইনস্টাইনের এমত রচনার পর বর্তমানে প্রকৃতি কোন নতুন নিয়মে চলতে শুরু করেনি, তা কি নিশ্চয় করে বলতে পারা যায়? আর আপেক্ষিকবাদ— Law of Reletivity-র স্থানে নতুন যে নিয়ম এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে ভিত্তি করে আজ গবেষণা শুরু করলে সেই গবেষণা শেষ হবার পূর্বেই হয়ত সে নিয়ম বদলে গেছে এবং আবার এক নতুন নিয়ম এসে সেখানে জায়গা দখল কয়ে বসেছে। আর প্রকৃতির অবস্থাই যদি এরূপ হয়, তা হলে বাহ্য জগত থেকে কোন জ্ঞান আহরণ— এবং সে জ্ঞানকে 'জ্ঞান' বলে মনে করে তার ওপর নির্ভর করা কিছুতেই এবং কখনই যুক্তিসংগত বা বুদ্ধিমানের হতে পারেন। আর তা হচ্ছে এক চরম অনিশ্চিত অবস্থাও।

কিন্তু মানুষ এই অনিশ্চিত অবস্থায় কিছুতেই স্থিতি ও স্বস্তি পেতে পারে না। মানুষের জন্যে চাই স্থির নিশ্চিত জ্ঞান— চাই চিরস্থায়ী অপরিবর্তনীয় সত্য। আর প্রকৃতি যে সেইরূপ জ্ঞানই দেয়— দিতে পারে, তাতে কোন সুস্থ মস্তিস্ক লেকেরই সন্দেহ থাকতে পারে না।

৬. রাষ্ট্র

মার্কসীয় মতে রাষ্ট্র সব সময়ই জুলুম শোষণের সাহায্যকারী হয়েছে। কেননা এর উৎপত্তিই হয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষার জন্যে— নিতান্ত অর্থনীতির কারণে। কাজেই এ ধরনের রাষ্ট্রে যে শ্রেণী সংগ্রামের উদ্ভব হবে তা-ই leads to the dictatorship of the proletariat এবং This dictatorship itself only constitutes' The transition of all classless society এবং সেখানে কোন রাষ্ট্রের প্রয়োজন হবেনা।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মত স্বীকার্য কিনা, তার বিচার করার জন্যে আমাদের একটু ভাবতে হবে।

রাষ্ট্র মানুষের জীবনে ঠিক কখন কি ভাবে উদ্ভূত হয়েছিল সে চিন্তা অবান্তর। তবে রাষ্ট্র যে মানুষের জীবনে অপরিহার্য তাতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না। কেননা, মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব, দলবদ্ধ হয়ে থাকার চেষ্টা মানুষের জন্মগতই। তাই রাষ্ট্র যে বিভিন্ন দিক দিয়ে Common interest-কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, সে সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দ্বিমত নেই। আর সে সমস্বার্থ যে অর্থনীতিভিত্তিক ছিল তা কিছুতেই বলা যেতে পারে না। রাষ্ট্র গঠনের মূলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে— Force of state building হিসেবে কাজ করে রক্ত Kinship— জাতিত্ব, ধর্ম— Religion industry ও যুদ্ধ। আর এ সব কিছুর মূলে রয়েছে The feeling of unity and solidarity। এ কারণে রাষ্ট্র শুধু গঠিতই হচ্ছে না, দিন দিন তার শ্রী বৃদ্ধিও হচ্ছে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে শান্তি, শৃংখলা স্থাপন ও অত্যাচার-অনাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশ্রয়ের প্রয়োজনেই বহুরকমের শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব— R. C. Gettell তার Polotical Science-এ লিখেছেন ঃ It came into existence gradually as the natural result of many and diverse forces resulting from the need of men for order and protection.

রাষ্ট্রের উদ্ভব যেভাবেই হোক না কেন, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রশক্তির ব্যবহার State and Goverment এক নয়— এ দুটো জিনিস আলাদা আলাদাভাবেই তার

যাচাই ও বিচার হওয়া উচিত। তাই রাষ্ট্র ঠিক থাকলেও হতে পারে যে, গভর্ণমেন্ট খারাপ লোকের হাতে পড়ে তার অপব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে রাষ্ট্রটি তো আর খারাপ হয়ে যায়নি। ইতিহাসে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রশক্তি অত্যাচার ও নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন, তেমনি Human consolidation and wellbeing-এর কাজেও তার অবদান কোন অংশে কম নয়।

কাজেই সমাজ জীবনে ব্যক্তিগত মালিকানা কখনো যদি লোপ পায়— পাওয়া সম্ভব নয় অবশ্য— তা হলেও রাষ্ট্রের প্রয়োজন কখনো ফুরাবে না, ফুরোতে পারে না। কেননা রাষ্ট্র কেবল ব্যক্তিগত মালিকানার কারণে ও তাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেনি। আমরা দেখছি, মার্কসবাদ Proletariat-দের ডিকটেটরশিপের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে Fascist রূপে একান্ত অপরিহার্য হিসেবে মেনে নিচ্ছে ; কিন্তু তাদের দ্বারা বুর্জ্জোয়া নিধন কার্য সম্পন্ন হবার পর যখন Social unit-এর Levelling বা সমতাবিধানের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখনি হবে মার্কসবাদী রাষ্ট্র বিলুপ্তির মাহেন্দ্রক্ষণ। কিন্তু মানুষ রাষ্ট্রের প্রয়োজন থেকে কখনো নিষ্কৃতি পেতে পারে না।

মানুষের জীবন কেবল শ্রেণীস্বার্থেই সীমাবদ্ধ নয়, তাদের জীবনের আরো অনেক দিক আছে, আছে অনেক দায়-দায়িত্ব। সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত ও সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে ততদিন যতদিন ধরিত্রীর বুকে মানুষ নামক জীব বাস করতে থাকবে। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় ঃ

'To live with others is the condition of a rational existence. There is in emplied the necessity of govrement, Since the activities of a civilized cmmunity are too numerous and too complex to be left unregutated.'

তাই মানুষের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত state-এর প্রয়োজন আছে এবং থাকবে। আর থাকার উদ্দেশ্য হবে— রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ভাষায় only to enable the mass of men to realixe social good on the largest possible scale.

শেষ কথা, শুধু অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরেই যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং স্বার্থের অবসান হলেই যে রাষ্ট্রের অবসান হবে, মার্কসবাদীদের এ বিশ্বাস একান্তই অন্ধবিশ্বাস, এক অলীক কল্পনাবিলাস। কারণ রাষ্ট্রের উদ্ভব শুধু একটি কারণেই ঘটেনি, বহু কারণই তার রয়েছে। আর মানুষের শেষ জীবন মুহূর্ত পর্যন্ত সে কারণগুলোও কোন-না-কোন Form-এ অবশ্যই বর্তমান থাকবে।

৭. মানুষ ও ধর্ম

ধর্মের প্রয়োজন আছে কি ? এ প্রশ্নের জবাব মার্কসীয় দর্শনে নির্ভুল মিলতে পারে না। কেননা 'Man is a spritual being' বলতে মানুষের যে দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার কোন চর্চা বা গবেষণা করেনি সে বিজ্ঞান— যার ওপর মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি। বিজ্ঞানের এত দিনকার যা কিছু শিক্ষা তাতে যান্ত্রিক বিবর্তনের নেহাৎই একটি যান্ত্রিক উৎপাদন হিসেবেই মানুষের বিচার— মানুষের পরিচয়। একদিকে অন্ধ ডারউইনীয় জীবন-সংগ্রাম আর অপরদিকে ওয়াটসনের আচরণবাদ behaviourism— এদুয়ের মাঝে জড়জগতের ফরমূলা ছাড়া আর কিছুর জায়গা নেই সেখানে। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আজ এ ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। এখনকার বিজ্ঞান বলে ঃ

> "Science cannot deny that man recognise and acclaims truth, goodness and beauty in all their forms, এবং means higher activities are prompted and sustained by spiritual ideas by his aspirations towards truth. Goodness and beauty' (Riligion and the science of life by M. C. Dougall)

বস্তুত জড়বিজ্ঞানের ফরমূলা যে জীববিজ্ঞানে চলে না, একথা আজ বিজ্ঞান জগতেই স্বীকৃত। স্বয়ং J. H. Halane এ বিষয়ে বলেছেন ঃ

> Physical science cannot express or describe biological phenomena so that its claim to represent objective reality cannot be admitted.

আর ধর্মেকে নিছক কু-সংস্কার বলে জড়িয়ে দেয়াও কোন যুক্তিসংগত কাজ নয়। প্রাকৃতির ভয় আতংক থেকে রক্ষা পাওয়ার ইচ্ছা এবং বুর্জোয়াদের শোষণ পীড়নের যথার্থতা প্রমাণই যে ধর্মের উদ্ভবের কারণ, একথা কেবল গায়ের জোরেই বলা যেতে পারে। ধর্মের মূলত যে কাজ, তা মানুষের সহজাত ভাবধারাই অভিব্যক্তি। মানুষ এই বিশ্বপ্রকৃতি দেখে কেবল ভয়ই পায় না। অসংখ্য ও অফুরন্ত নিয়ামত পেয়ে মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণও করে। তাই মানুষের জীবনের Higher values ধর্মকে মানা। আল্লাহ্‌র সমীপে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়া যে তার একটি বিশেষ অঙ্গ, একথা অস্বীকার করবার কোনই উপায় নেই।

ধর্ম যদি শাসক শ্রেণীর শোষণ ও নিষ্পেষণের হাতিয়ার হয়েও থাকে, তবে তা খৃষ্টানধর্ম, হিন্দু ধর্ম .... ইসলাম নয়। কেননা ইসলাম সে রকম কোন ধর্মই নয়, যা মানুষের হাতের শোষণ পীড়নের হাতিয়ার হয়ে থাকে, ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি, যা শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে সকলেই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে পালন করে চলতে বাধ্য। মূল রাষ্ট্র ও সরকারকেই গঠিত হতে হয় চলতে হয়— দায়িত্ব পালন করতে হয় ইসলামের বিধান অনুযায়ী। তাই তা কারুর হাতিয়ার হয় না।

৮. পারিবারিক জীবন

মার্কসীয় দর্শন মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার কারণেই পরিবার গড়ে উঠেছে এবং এই প্রথার বিলোপ হলেই পরিবারও খতম হয়ে যাবে।

কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার প্রথারও বিলুপ্তি কি সম্ভব ? পরিবার ব্যবস্থা কি এতই ঠুনকো ?

এ সম্পর্কে যত চিন্তাই করা হবে, প্রমাণিত হবে যে, পরিবার প্রথার উৎপত্তি সম্পর্কে মার্কসীয় দর্শন সম্পূর্ণ ভুল মত পোষণ করে। অতএব তার ভবিষ্যদ্বাণীও ভিত্তিহীন। কেননা কেবল ব্যক্তিগত সম্পত্তির কারণেই পরিবার হয়নি। মানুষের যৌনবৃত্তি, যৌবনের তাগিদ, তার সজীব সক্রিয় অনুভূতিপ্রবণ মন— এগুলোও মানুষের পারিবারিক জীবনের ভিত্তিভূমি। তাই ঃ

Being the result of plural forces the family will not get abolished by the aboliton of private property"

তবু জোর করেই যদি পরিবার-প্রথা খতম করা হয়, তাহলে তার বিনিময়ে আমরা কি পাব ? মানুষের প্রকৃতিতে তার ব্যক্তি জীবনে সে এমন একটা জায়গা চায়, যেখানে নিজের খুশীমত হাত পা ছড়িয়ে সে বলতে পারবে 'এটা আমার'। পরিবারই হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্ববোধ তথা তার স্বাধীন বিচরণের ক্ষেত্র। এখানে সে তার মায়ের ছেলে, স্ত্রীর স্বামী, বোনের-ভাই, সন্তানের পিতা। এরা তার সম্পত্তি নয়, এদের মায়ার বন্ধনে সে বাঁধা এবং এতেই তার পরম তৃপ্তি। এখানেই তার নিজস্ব সঞ্চরণ সম্ভব হতে পারে। কিন্তু পরিবারকে লুপ্ত করে দিলে ব্যক্তির এ বিকাশের ক্ষেত্রটাকেই একেবারে শিকড় ধরে টান দিয়ে উপড়ে ফেলা হবে। ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন মানুষের ব্যক্তিটাই দমবদ্ধ হয়ে মারা পড়বে।

কেবল ব্যক্তির জন্যেই পরিবার প্রয়োজন একথা নয়। মানুষের সামাজিক জীবনেও প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসায় আবদ্ধ এ সুখনীড় একান্তই জরুরী। সহজ কথায়, মানুষের মিলিত জীবনের সৌন্দর্য সামঞ্জস্য ও কল্যাণের সাধনায় পারবারিক জীবনের সেই প্রীতি ভালবাসার শিক্ষাই হয় তার প্রধানতম ভিত্তিভূমি। তাই পরিবারকে বাঁচাতে হবে মানুষের সমাজ জীবনের প্রথম unit হিসেবেও। পারিবারিক জীবনের ছোট্ট গণ্ডিতেই মানুষ শিখতে পারে পরার্থে নিজের সুখ-সুবিধা কি করে বিসর্জন দিতে হয়। কেননা—

The highest developments of altruism have owed more to the family and the home than to any other influence এবং the home and the family have fostered and developed love in the human race.

গত মহাযুদ্ধের সময়ে ও পরে অসংখ্য মা-বাপহারা শিশুর পালন কেন্দ্র খোলা হয়। এতে লালিত-পালিত শিশুদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যেসব শিশুকে বসুধাত্রী লালন করেছে তাদের ব্যক্তিত্ব সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। বড় অস্থির, চঞ্চল, চরিত্রহীন হয়ে উঠেছে তারা। তাদের মধ্যে সহভালবাসার কোন লক্ষণই দেখা যায়নি। অবৈধ সন্তানদের মাঝেও

দেখা গেছে হীনমন্যতা। পরিবারহীন সমাজের লক্ষ্যকোটি শিশু সঠিকভাবে মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না।

শেষ কথা

আমার এই দীর্ঘ আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আলোচনাটি দীর্ঘ হলেও মার্কসীয় দর্শনের ভ্রান্তি আমাকে খুব সংক্ষেপেই দেখাতে হয়েছে। কেননা এর ভ্রান্তি এতবেশি, এত বহুমুখী যে, তার সবদিক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দু'চারদিনের প্রয়োজন। তবে মোটামুটিভাবে যা কিছু আলোচনা করা হলো, তার ভিত্তিতে এ কথা জোর করে বলা চলে যে, মার্কসীয় দর্শন একটা সুস্পষ্ট প্রতারণা মাত্র। মানুষকে তার মনুষ্যত্বের মহান মর্যাদা থেকে বিচ্যুত ও মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য থেকে চিরতরে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যেই এ দর্শন রচিত হয়েছে। আলোচনা গভীর দৃষ্টিতে যারা পাঠ করবেন, আমি আশা করি, মার্কসীয় দর্শনের বিভ্রান্তি থেকে তাঁরা নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করবে। একজন লোকও যদি এ থেকে সে কল্যাণ লাভ করতে পারেন, তবে আমি বুঝবো, আমার আলোচনা স্বার্থক হয়েছে।[১]

১. প্রবন্ধটি মূলতঃ ১৯৬১ সনে তদানীন্তন ঢাকাস্থ তা'মীরে মিল্লাত সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত ১০ দিন ব্যাপী ইসলামী সেমিনারে প্রদত্ত একটি ভাষণ। পরে 'চিন্তাধারা' নামক সেমিনার সংকলনে একটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ সনে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত একটি বিশেষ প্রবন্ধ সংকলনেও তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়েবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সুদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ)-এর বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও 'ইসলামে হালাল হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাসের ঐতিহাসিক তফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থটি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই যুগস্রষ্টা মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)

খায়রুন প্রকাশনী